ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ▪ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৫

সচিত্র বাংলাদেশ

ভাষা নিয়ে আমাদের সংগ্রাম

শহিদ দিবস থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্ন ও যতিচিহ্নের ব্যবহার

মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলে বাংলা সাহিত্যের প্রসার

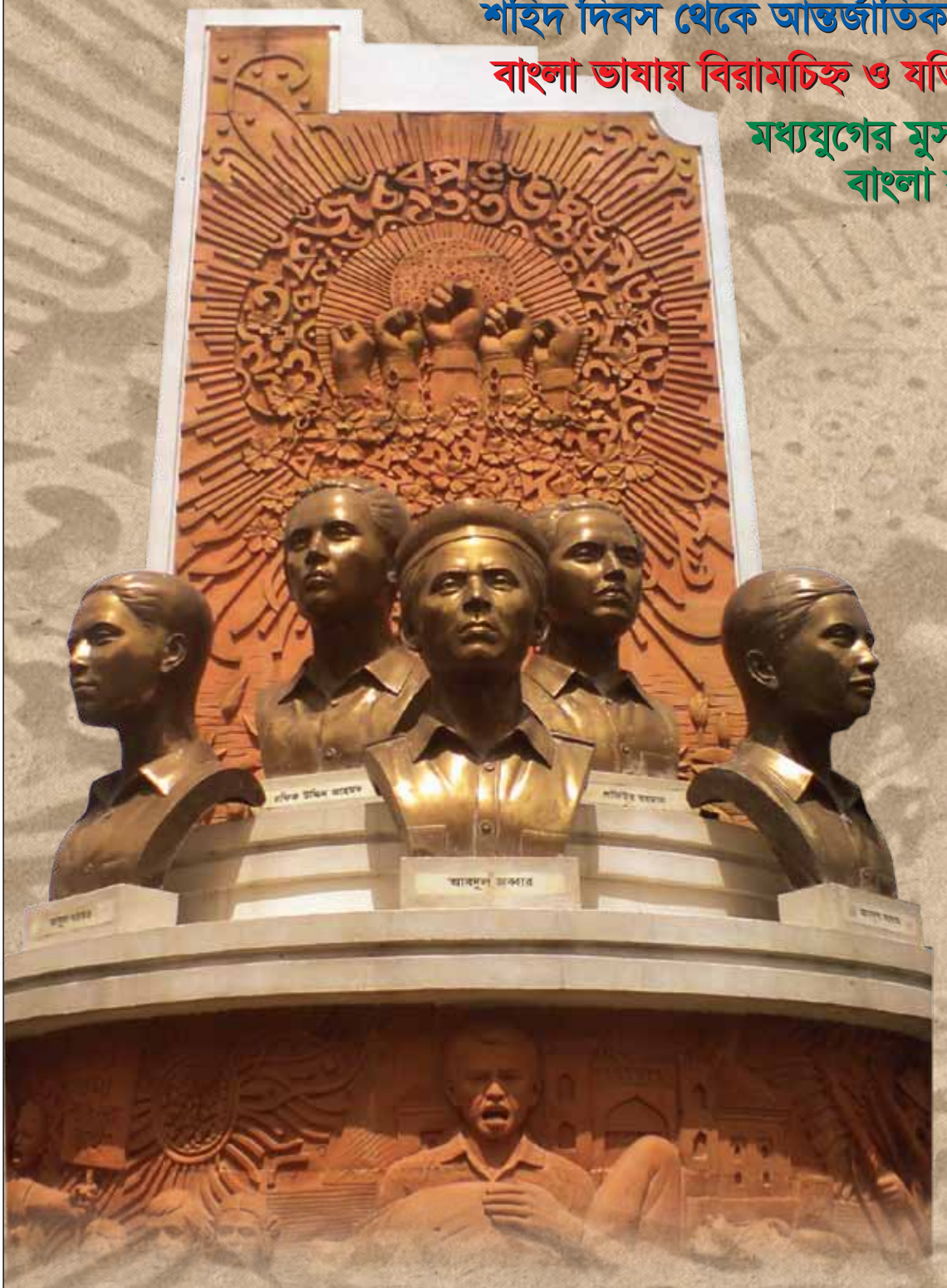

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

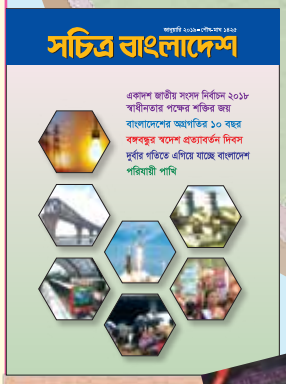

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

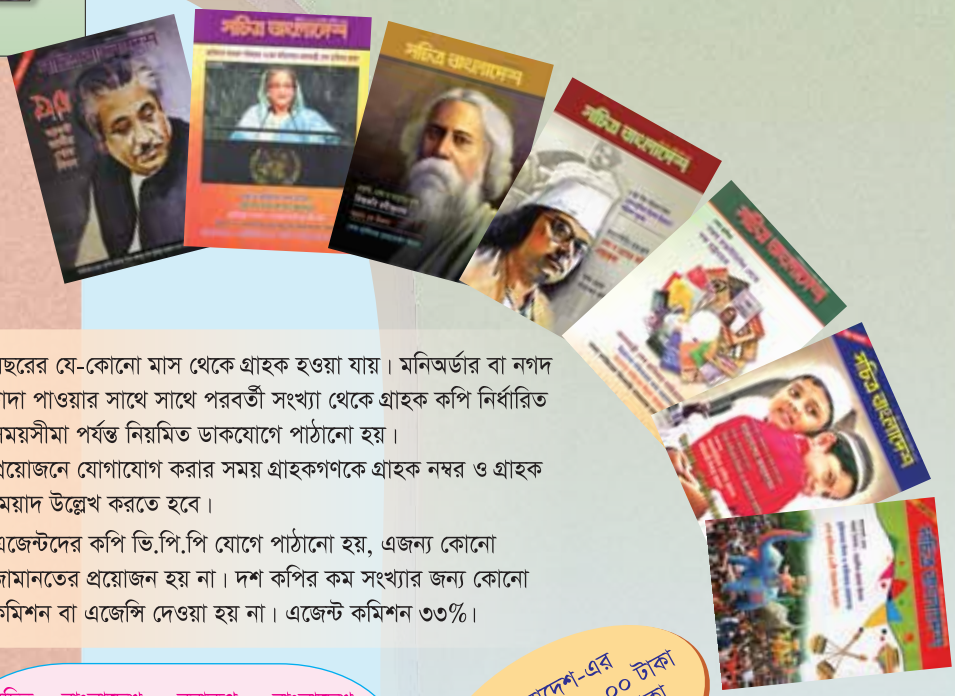

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : **bangladeshquarterly@yahoo.com**
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 39, No. 08, February 2019, Tk. 25.00

পলাশ ফুল

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ

ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ❑ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৫

সম্পাদকীয়

অমর একুশে বাঙালি জাতির প্রেরণার উৎস। ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় প্রাণ দিয়েছিলেন রফিক, সালাম, জব্বার, বরকতসহ নাম না জানা আরো অনেকে। তাদের প্রতি রইল আমাদের সালাম ও শ্রদ্ধা। ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আন্তর্জাতিক এই স্বীকৃতির জন্য কানাডা প্রবাসী কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই উদ্যোগের পূর্ণতা পায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে। ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশের নিজস্ব এ দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষিত হওয়ার পর বিশ্বে অন্যান্য ভাষাভাষীর মধ্যেও নতুন উদ্দীপনা জেগেছে। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর হারিয়ে যাওয়া বা বিলুপ্তপ্রায় মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত হবে এ প্রত্যাশা করছি। একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে বাংলা ভাষার এই বিশ্বযাত্রা আমাদের গর্বিত করে। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হলো *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটিতে।

শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার গঠন করেন। তিনি ২৫শে জানুয়ারি জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেন। এ সংখ্যায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি প্রকাশিত হলো।

এছাড়া প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার, গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ নিয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
নাফেয়ালা নাসরিন

কপি রাইটার
মিতা খান

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬, ৯৩৩২১২৯
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : সহকারী পরিচালক
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ
জাতির উদ্দেশে
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪
ভাষা নিয়ে আমাদের সংগ্রাম ৮
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
পরিপ্রেক্ষিত ভাষা আন্দোলন
সমাবেশ-মিছিলে জানা-অজানা শহিদ ৯
আহমদ রফিক
শহিদ দিবস থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ১১
সৌরভ সিকদার
কম্পিউটারে বাংলা প্রচলনের ৩৪ বছর ১২
জেসিকা হোসেন
ভাষা আন্দোলনের প্রথম উপন্যাস
বীজাঙ্কুর ১৩
খালেক বিন জয়েনউদদীন
না ফেরার দেশে আমজাদ হোসেন ১৪
মিতা খান
অমর একুশের চেতনা
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ১৫
মিজানুর রহমান মিথুন
মাতৃভাষা ১৬
তনয় সালেহা
বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্ন ও যতিচিহ্নের ব্যবহার
ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ১৭
ড. মোহাম্মদ হাননান
কর্মমুখী শিক্ষা ছাড়া সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয় ২০
ফারিহা হোসেন
মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলে
বাংলা সাহিত্যের প্রসার ২১
সুফিয়া বেগম
জয়তু চন্দ্রাবতী ২৫
লিলি হক
বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব ২৮
বীরেন মুখার্জী
বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ে ৩০
ড. আতিউর রহমানের সাক্ষাৎকার
নারীপ্রধান পরিবার বৃদ্ধি ৩৫
বিনয় দত্ত
দুর্যোগে তথ্য জানা ও বোঝার প্রযুক্তি ৩৬
মো. শাহেদুল ইসলাম

হাইলাইটস

শ্রদ্ধাঞ্জলি
সৈয়দ জাহাঙ্গীরের মহাপ্রয়াণ ৩৭
সুহৃদ সরকার
অসমীয়া ভাষায়
বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ৩৮
কে সি বি তপু
থেমে গেল ইমতিয়াজ বুলবুলের সুরের মূর্ছনা ৪০
মো. সালাহউদ্দীন
গল্প
হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন ৪২
মুহাম্মদ ইসমাঈল
কবিতাগুচ্ছ ২৪, ৩৪, ৩৯, ৪১
জাকির আবু জাফর, জুননু রাইন, রওশন ঝুনু নির্মল চক্রবর্তী, সুধীর কৈবর্ত, হুমায়ূন মুজিব আহমদ আখতার, রুস্তম আলী, শাহনাজ তাহমিনা বেগম, জাকির হোসেন চৌধুরী ওয়াসীম হক, মিয়াজান কবীর, হাসান হাফিজ সৈয়দ শাহরিয়ার, শাহরিয়ার নূরী, সাদিয়া সুলতানা নাজমুল হাসান
বিশেষ প্রতিবেদন
রাষ্ট্রপতি ৪৪
প্রধানমন্ত্রী ৪৫
তথ্য মন্ত্রণালয় ৪৭
জাতীয় ঘটনা ৪৮
আন্তর্জাতিক ৪৯
উন্নয়ন ৪৯
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫০
শিক্ষা ৫১
শিল্প-বাণিজ্য ৫২
বিনিয়োগ ৫২
নারী ৫৩
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৪
কৃষি ৫৪
কর্মসংস্থান ৫৫
নিরাপদ সড়ক ৫৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৬
যোগাযোগ ৫৭
মাদক প্রতিরোধ ৫৭
স্বাস্থ্যকথা ৫৮
প্রতিবন্ধী ৫৯
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৫৯
সংস্কৃতি ৬০
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬১
চলচ্চিত্র ৬২
ক্রীড়া ৬২
বিশ্বজুড়ে ফেব্রুয়ারি: স্মরণীয় ও বরণীয় ৬৪

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এ নিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন দল চতুর্থবার এবং টানা তৃতীয়বার জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। ৭ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর তিনি দেশের উন্নয়নে কাজ শুরু করেছেন। তিনি ২৫শে জানুয়ারি টেলিভিশন ও বেতারে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বিভেদ ভুলে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে সকলকে দেশের উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত জাতির উদ্দেশে ভাষণ পড়ুন, পৃষ্ঠা-৪

ভাষা নিয়ে আমাদের সংগ্রাম

আমাদের এবারের সংগ্রাম হচ্ছে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির উদ্দেশ্য, আদর্শ ও চেতনাকে আবার ফিরিয়ে আনা। মাতৃভাষাকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া এবং সর্বোপরি বাংলা ভাষাকে নানান বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা। তাহলেই আমরা একুশে শহিদদের প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখাতে পারব। এ বিষয়ে নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-৮

শহিদ দিবস থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। মায়ের ভাষাকে রক্ষার জন্য রাজপথে আন্দোলন হয়। পাকিস্তানি সরকারি বাহিনীর গুলিতে প্রাণদান করে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা। সালাম-বরকত-রফিক-শফিক-জব্বার আরো কত নাম না-জানা সেসব শহিদের আত্মত্যাগে আমরা ফিরে পাই আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলা। জাতিসংঘের স্বীকৃতির ফলে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে সারাবিশ্বে। একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কীভাবে হলো-সে বিষয়ে নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১১

বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্ন ও যতিচিহ্নের ব্যবহার ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

বিরামচিহ্ন ছাড়া কোনো লেখা পাঠ করা যায় না, লেখাও যায় না। এক শ্বাসে কোনো লেখা পাঠ করতে গেলে মানুষ অসুস্থ হয়ে যাবে, মৃত্যুও ঘটতে পারে, লেখাটির অর্থও বোধগম্য হবে না। তাই বিরামচিহ্নের একটি প্রধান কাজ হলো কোনো লেখা পাঠ করার সময় ১. শ্বাস বিরতির জায়গাটা দেখিয়ে দেওয়া ২. কোথায়, কতক্ষণ থামতে হবে তা নির্দেশ করা ৩. শ্বাস বিরতির শৈলী বা ভঙ্গিমা প্রকাশ করা। অর্থাৎ বিরামচিহ্ন বাক্যে থাকার কারণেই কোনো লেখার মূল বক্তব্য পাঠকের কাছে সহজ হয়ে ওঠে। বলা চলে, লেখক যেভাবে কথাটি বলতে চেয়েছিলেন পাঠক সেভাবেই লেখাটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তাই বিরামচিহ্ন বাক্যের অর্থ বোঝার জন্য এক সহায়ক শক্তি। আজ থেকে অন্তত এক হাজার বছর পূর্ব থেকেই বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্ন ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এ নিয়ে প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১৭

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

[২৫শে জানুয়ারি ২০১৯]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

গত ৩০শে ডিসেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটকে বিপুলভাবে বিজয়ী করার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একইসঙ্গে আমি মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জানুয়ারি ২০১৯ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন–পিআইডি

যারা নৌকায় ভোট দিয়ে আমাদের বিজয়ী করেছেন আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। যারা আমাদের ভোট দেননি, আমি তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল ও জোট এবং প্রার্থীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সকল নেতা-কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সহযোগিতায় আমরা এ বিশাল বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য আমি দেশবাসী, নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সশস্ত্রবাহিনীর সকল সদস্যের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। মুক্তিযোদ্ধাদের আমি সালাম জানাচ্ছি।

আমি গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের শিকার আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, আমার তিন ভাই- মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ও দশ বছরের শেখ রাসেল, কামাল ও জামালের নবপরিণীতা স্ত্রী সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ নাসের, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার জামিল এবং পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এএসআই সিদ্দিকুর রহমান-সহ সেই রাতের সকল শহিদকে।

এ উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য যাঁরা অকাতরে জীবন দিয়েছেন সেই ভাষা শহিদদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

স্মরণ করছি, ২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় নিহত আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভী রহমানসহ ২২ নেতা-কর্মীকে। স্মরণ করছি, ২০০১ সালের পর নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া, আওয়ামী লীগ নেতা আহসানউল্লাহ মাস্টার, মঞ্জুরুল ইমাম, মমতাজউদ্দিনসহ ২১ হাজার নেতা-কর্মীকে।

২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামাত জোটের অগ্নিসন্ত্রাস এবং পেট্রোল বোমা হামলায় যারা নিহত হয়েছেন আমি তাদের স্মরণ করছি। আহত ও স্বজনহারা পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসীদের হামলায় ২৪ জন নেতা-কর্মী নিহত হয়েছেন। তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দুই বারের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রী, সদ্য সমাপ্ত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম-সহ দশম সংসদের যেসব সদস্য ইন্তেকাল করেছেন, আমি তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রিয় দেশবাসী,

এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় ছিল খুবই প্রত্যাশিত। নির্বাচনের আগে দেশি-বিদেশি জরিপগুলিও এ রকমই ফলাফলের ইঙ্গিত দিয়েছিল। লন্ডনভিত্তিক ইকোনমিক ইনটেলিজেন্স ইউনিট এবং রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট সেন্টারের জরিপের ফল আপনারা লক্ষ করেছেন।

আমাদের এই ল্যান্ডস্লাইড বিজয়ের কয়েকটি কারণ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

❑ বিগত ১০ বছরে দেশে যে উন্নয়ন হয়েছে, সাধারণ মানুষ তার সুফল পেয়েছেন।

❑ দশ বছর আগে যে বালক/বালিকাটি হারিকেন বা কুপির আলোয় পড়ালেখা করত, গ্রামে পাকা রাস্তা দেখেনি, তরুণ বয়সে সে এখন বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় পড়াশোনা করছে, মোটরযানে যাতায়াত করছে।

❑ যে বয়স্ক পুরুষ-নারী পরিবারে ছিল অবহেলিত-অপাঙ্‌ক্তেয়, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা তাঁকে সংসারে সম্মানের জায়গায় নিয়ে গেছে।

❑ গ্রামবাংলার খুব কম পরিবারই আছে, যে পরিবার সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উপকারভোগী নয়। কোনো না কোনোভাবে প্রতিটি পরিবার উপকৃত হচ্ছেন।

❑ কৃষি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, ভ্যান বা রিকশাচালকসহ নিম্নবিত্তের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে। ১০ বছর পূর্বে একজন কৃষি শ্রমিক তার দৈনিক মজুরি দিয়ে বড়োজোর ৩ কেজি চাল কিনতে পারতেন। এখন তিনি ১০ কেজি চাল কিনতে পারেন।

❑ সরকারি চাকরিজীবীগণের বেতনভাতা বিগত ১০ বছরে আড়াই থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

❑ সরকারি ও বেসরকারি খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাও সমহারে বেড়েছে। যেমন পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ১৬০০ টাকা থেকে ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮ হাজার টাকা হয়েছে।

❑ কৃষিজীবীদের সার, বীজসহ বিভিন্ন উপকরণে ভরতুকি প্রদানের মাধ্যমে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে।

❑ ব্যবসায় এবং শিল্পবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে একদিকে কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে অন্যদিকে রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছে। যার সুবিধা সাধারণ জনগণ পাচ্ছেন।

❑ পদ্মাসেতু, ঢাকা মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মহাসড়কগুলোকে চার লেনে উন্নীতকরণসহ মেগা প্রকল্পগুলো দৃশ্যমান হওয়ায় সাধারণ মানুষের বর্তমান সরকারের ওপর আস্থা জন্মেছে।

❑ মানুষ নিজের এবং দেশের মর্যাদা চায়। আমরা বাংলাদেশকে সেই মর্যাদা এনে দিতে পেরেছি। স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ৪৬ বছর পর উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা প্রাপ্তি জনগণকেও গর্বিত করেছে। ভিক্ষুকের দেশের দুর্নাম ঘুচেছে। যাঁরা মানুষকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন, তাঁদের মানুষ মর্যাদা দিবেন- এটাই স্বাভাবিক।

❑ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০১৪ সালের পর থেকেই নির্বাচনি প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। প্রতিটি সম্ভাব্য প্রার্থী নিজ নিজ এলাকায় জনসংযোগ বাড়িয়েছেন এবং এলাকার উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। এবারের নির্বাচনে দলের প্রতিটি নেতা-কর্মী মনোনীত প্রার্থীর জন্য কাজ করেছেন।

❑ আমাদের নির্বাচনি প্রস্তুতি ছিল ব্যাপক। সরাসরি সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের পাশাপাশি আমরা ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছি।

❑ নির্বাচনি প্রচারকালে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাবেক আমলা, আইনশৃঙ্খলাবাহিনী এবং সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা- সকলেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন। একটি সমাজের প্রায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ যখন কোনো দলের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন, তখন তাকে কোনোভাবেই আটকে রাখা যায় না।

পক্ষান্তরে আমাদের প্রতিপক্ষ জোটের নির্বাচনি কৌশল সম্পর্কে আপনারা ভালোভাবেই জানেন। আমি এ নিয়ে কথা বলতে চাইনে। তাদের পরাজয়ের বহুবিধ কারণ রয়েছে:

❑ এক আসনে ৩-৪ জন বা তারও বেশি প্রার্থী মনোনয়ন;

❑ মনোনয়ন নিয়ে ব্যাপক বাণিজ্যের অভিযোগ এবং দুর্বল প্রার্থী মনোনয়ন;

❑ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন– সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা;

❑ নিজেরা জনগণের জন্য কী করবে, সে কথা তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে ক্ষমতায় গেলে আমাদের বিরুদ্ধে কী ধরনের প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা নিবে– তাদের প্রচারণায় প্রাধান্য পেয়েছে।

❑ সোসাল মিডিয়ায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা ছাড়া নিজেদের সাফল্যগাথা তুলে ধরতে পারেনি।

❑ তাছাড়া, ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামাতের দেশব্যাপী অগ্নিসন্ত্রাস ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি।

❑ সর্বোপরি, বিএনপির ধানের শীষ মার্কায় যুদ্ধাপরাধী জামাত নেতাদের মনোনয়ন তরুণ ভোটাররা মেনে নিতে পারেনি। তরুণেরা আর যাই হোক স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তির পক্ষ নিতে পারে না।

এ রকম আরো বহু উদাহরণ দেওয়া সম্ভব, যার মাধ্যমে প্রমাণ করা যাবে যে, সাধারণ ভোটারগণ বিএনপি'র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং নৌকার অনুকূলে এবার গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা টানা তৃতীয়বার এবং ১৯৯৬ সাল থেকে চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে সরকার পরিচালনার ম্যান্ডেট দিয়েছেন। আপনাদের এবারের এই নিরঙ্কুশ সমর্থন আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের এই রায়কে দেশবাসীর সেবা এবং জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার ও সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ বলে মনে করি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কথামালার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। আমরা যে প্রতিশ্রুতি দেই, তা বাস্তবায়ন করি। ২০০৮ এবং ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে যেসব প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছিলাম তার অধিকাংশই ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছি।

একাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ' স্লোগান সংবলিত নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেছি। ইশতেহার ঘোষণাকালে আমি এর সারাংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম। আপনারা অনেকেই এই দলিলটি ইতোমধ্যে পড়েছেন।

আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমাদের যে-কোনো নীতিমালা প্রণয়নে এবং উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এই ইশতেহারটি পথ-নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ বিস্তার, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নসহ আর্থসামাজিক নানা সূচকে বাংলাদেশ বিগত দশ বছরে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। শুধু এশিয়ার দেশগুলোরই শীর্ষে নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন অনেক উন্নত দেশকেও ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তাই বাংলাদেশকে চেনেন 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে।

আমাদের এই পথচলা মসৃণ ছিল না। শত প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করে আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছি। যার

সুফল আজ জনগণ পাচ্ছেন। এ অর্জন শুধু সরকারের নয়, এ অর্জন দেশের প্রতিটি পরিশ্রমী মানুষের।

আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ২১.৮ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে যা ২০০৫-৬ সালে বিএনপি সরকারের আমলে ছিল ৪১.৫ শতাংশ। মাথাপিছু আয় ৫৪৩ মার্কিন ডলার থেকে ১ হাজার ৭৫১ ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩ বিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিএনপি সরকারের ২০০৫-৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল মাত্র ৬১ হাজার কোটি টাকা। যা ৭.৬ গুণ বৃদ্ধি করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমরা ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকার বাজেট দিয়েছি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিমাণ ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা। যার নব্বই ভাগ বাস্তবায়ন হয় নিজস্ব অর্থায়নে। কারো কাছে আমাদের হাত পেতে চলতে হয় না।

গত অর্থবছরে আমাদের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮৬ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি ৫.৪ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় রয়েছে।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের একটি এখন বাংলাদেশ। প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারস-এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, ২০৪০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্বে ২৩তম স্থান দখল করবে।

এইচ.বি.এস.সির প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৬তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে। আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি। ভারতের সঙ্গে স্থল সীমানা চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহল সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

দশ বছর আগের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। মানুষের জীবনমান এখন অনেক উন্নত। এখন মানুষ সুন্দর করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। দেশকে আমরা আরো উন্নত করতে চাই। তাই সামনে অনেক কাজ আমাদের। আরো কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে। আপনাদের সঙ্গে নিয়ে সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় দেশবাসী,

আমাদের সামনে সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব শিক্ষিত তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। তরুণদের কর্মসংস্থানের জন্য আমরা বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

এগুলোর মধ্যে রয়েছে– তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করা, তরুণ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা ও প্রণোদনা প্রদান, সরকারি উদ্যোগে কর্মসংস্থান পরিকল্পনা, তরুণ উদ্ভাবকদের উদ্ভাবনসমূহ আন্তর্জাতিকভাবে পেটেন্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ, দেশ-বিদেশে কর্মে নিয়োগের জন্য কারিগরি বিষয়ে দক্ষ কর্মী তৈরি এবং কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি কলেজ স্থাপন করা। ইতোমধ্যে কারিগরি কলেজ স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই জানুয়ারি ২০১৯ গণভবনে নবনিযুক্ত মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন–পিআইডি

আগামি পাঁচ বছরে আমরা দেড় কোটি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলেছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগের জন্য আসছেন।

সারাদেশে ২ ডজনের বেশি হাইটেক পার্ক এবং আইটি ভিলেজ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, পর্যটন, সেবা খাতসহ অন্যান্য খাতে প্রাতিষ্ঠানিক এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

আমরা চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলো যথাসময়ে শেষ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মহেশখালি-মাতারবাড়ি সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পসহ ফাস্ট ট্রাক মেগা প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন কাজে গতি আনা হবে।

দেশের প্রতিটি গ্রামে শহরের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে। ছেলেমেয়েদের উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ তৈরি করা হবে। সুপেয় পানি এবং উন্নতমানের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। সুস্থ বিনোদন এবং খেলাধুলার জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। ইন্টারনেট/তথ্যপ্রযুক্তি সর্বত্র পৌঁছে যাবে।

প্রিয় দেশবাসী,

২০২০ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা ২০২০-২০২১ সালে মুজিব বর্ষ এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করব। বাঙালি জাতির এই দুই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা দেশকে আর্থসামাজিক খাতে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই। আর এর কৌশল হিসেবে আমরা ভিশন ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন করছি।

পাশাপাশি, জলবায়ুর ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলা করে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জনের জন্য আমরা 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নামে শতবর্ষের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি।

আমরা ইতোমধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাগুলো সম্পৃক্ত করে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজও শুরু হয়েছে।

সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়- আমাদের এই পররাষ্ট্র নীতিই বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্কের মূল হাতিয়ার। এই নীতির সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক যে-কোনো সময়ের চাইতে সুদৃঢ় এবং গভীর।

প্রিয় দেশবাসী,

এখন আমাদের প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য। বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের ঐক্যের যোগসূত্র হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সাম্য ও ন্যায়বিচার এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতি। বিজয়ের পর আমরা সরকার গঠন করেছি। সরকারের দৃষ্টিতে দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিক সমান। আমরা সবার জন্য কাজ করব।

সরকারি সেবা খাতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় জীবনের সর্বত্র আইনের শাসন সমুন্নত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করব। জাতীয় সংসদ হবে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রবিন্দু।

একাদশ সংসদে বিরোধীদলের সদস্য সংখ্যা নিতান্তই কম। তবে, সংখ্যা দিয়ে আমরা তাঁদের বিবেচনা করব না। সংখ্যা যত কমই হোক, সংসদে যে-কোনো সদস্যের ন্যায্য ও যৌক্তিক প্রস্তাব/আলোচনা/সমালোচনার যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে। আমি বিরোধীদলের নির্বাচিত সদস্যদের শপথ নিয়ে সংসদে যোগদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জানি, দুর্নীতি নিয়ে সমাজের সর্বস্তরে অস্বস্তি রয়েছে। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের নিজেদের শোধরানোর আহ্বান জানাচ্ছি। আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি উচ্ছেদ করা হবে। আমরা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির নির্মূল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। দুর্নীতি বন্ধে জনগণের অংশগ্রহণ জরুরি। তাই, গণমাধ্যমের সহায়তায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরির কাজ অব্যাহত থাকবে।

আপনারা দেখেছেন, আমরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে ইতোমধ্যেই মাদক, জঙ্গি তৎপরতা এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে সফলতা অর্জন করেছি। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আমরা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যেখানে হিংসা-বিদ্বেষ হানাহানি থাকবে না। সকল ধর্ম-বর্ণ এবং সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। সকলে নিজ নিজ ধর্ম যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে পারবেন।

বৈশ্বিক প্রভাবে কিংবা স্থানীয় প্ররোচনায় আমরা কিছু কিছু তরুণকে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ত হতে দেখেছি। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামে সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই। আমি সমাজের সকলকে মাদকাসক্তি ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারে আমরা কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছি। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী করা হচ্ছে। কওমি মাদ্রাসার দাওয়ারে হাদিস ডিগ্রিকে মাস্টার্স ডিগ্রির সমমানের করা হয়েছে। সারাদেশে ৫৬০টি মসজিদ-কাম-ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

প্রিয় দেশবাসী,

তরুণেরাই দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তারুণ্যের সৃষ্টিশীলতা, উদ্যম এবং শক্তির ওপর আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আস্থা রয়েছে। তারুণ্য মানেই বাংলা ভাষার জন্য আত্মদান, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, আসাদ-মতিউর, নূর হোসেনদের রক্তদান। তারুণ্য মানেই লাল-সবুজের পতাকা– আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, তারুণ্য মানেই বাঙালি এবং বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিল। আর ২০১৮ সালে আরেক বিজয়ের মাসে এ দেশের ভোটারগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছে, আমাদের দেশ সেবার সুযোগ করে দিয়েছে।

আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি– আমার ব্যক্তিগত কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। বাবা-মা-ভাই, আত্মীয়-পরিজনকে হারিয়ে আমি রাজনীতি করছি শুধু জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য; এ দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য। এ দেশের সাধারণ মানুষেরা যাতে ভালোভাবে বাঁচতে পারেন, উন্নত-সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী হতে পারেন– তা বাস্তবায়ন করাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন: 'মহৎ অর্জনের জন্য মহৎ ত্যাগের প্রয়োজন'। আমরা ত্যাগের পথ অনুসরণ করেই এগিয়ে যাচ্ছি। আমার বর্তমানকে উৎসর্গ করেছি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। আমরা তরুণদের শক্তি, মেধা ও মননকে সোনার বাংলা গড়ার কাজে সম্পৃক্ত করব। আজকের তরুণেরাই পারবে দেশকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে।

প্রিয় দেশবাসী,

নবীন-প্রবীণের সংমিশ্রণে আমি আমার মন্ত্রিসভা গঠন করেছি। প্রবীণদের অভিজ্ঞতা আর নবীনদের উদ্যম– এই দুইয়ের সমন্বয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

আপনারা আমার ওপর আস্থা রেখে যে রায় দিয়েছেন, কথা দিচ্ছি আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব সে আস্থার প্রতিদান দিতে। এজন্য দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের সমর্থন এবং সহযোগিতা চাই। আপনাদের সহযোগিতায় আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করব, ইনশাআল্লাহ।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায় বলতে চাই:

যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ভাষা নিয়ে আমাদের সংগ্রাম

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষা আন্দোলনের একটি প্রেক্ষাপট আছে যা শুধু দেশ বিভাগের সময় থেকে শুরু হয়নি, শুরু হয়েছে ১৯২১ সাল থেকে। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আমরা জানি– একটি ভাষাব্যবহারকারীরা যদি শুধু শিক্ষিত হন তাহলে সেই ভাষাকে সৃষ্টিশীল এবং মননশীলভাবে ব্যবহার করতে পারেন, ভাষাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকাশের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হয় এবং পিছিয়ে থাকা বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষার মর্যাদা বুঝতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তরুণদের বিশ্বের নানা জ্ঞান ও উদ্ভাবনী চিন্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটায় এবং এই তরুণরাই মাতৃভাষার চর্চা নতুন পর্যায়ে শুরু করে। বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাদের সন্তানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে থাকলে পরিবারগুলোতে মাতৃভাষার পক্ষে প্রবল সমর্থন তৈরি হয়। ফলে ১৯২১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যত রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে তাতে এই শিক্ষিত তরুণদের অংশগ্রহণ বেড়েছে।

১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতে নির্মিত প্রথম শহিদমিনার

১৯৪৭-এর দেশভাগের পর পূর্ববাংলা যখন পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হলো তখন এ ধরনের একটি চিন্তা তৈরি হয়েছিল যে পাকিস্তান রাষ্ট্রে আমাদের অধিকারগুলো সুরক্ষিত থাকবে। এই অধিকারের মধ্যে ছিল অর্থনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার এবং সাংস্কৃতিক অধিকার। কিন্তু ঔপনিবেশিক পাকিস্তান রাষ্ট্র কোনো অধিকারকেই স্বীকৃতি দিল না। তারা বরং ঔপনিবেশিক শাসকের মতো আমাদের সাংস্কৃতিক অধিকার নাকচ করে দিতে উদ্যোগ নিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ ঢাকায় এসে দম্ভভরে ঘোষণা দিল– উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এটি শুধু তাৎক্ষণিক কোনো ধৃষ্টতার ব্যাপার ছিল না। এটি ছিল আমাদের সংস্কৃতিকে দুর্বল করে ফেলার একটি চতুর পরিকল্পনা। কারণ ভাষাই হচ্ছে একটি সংস্কৃতির প্রধান বাহন। ভাষার স্বীকৃতি না থাকলে সংস্কৃতির স্বীকৃতি থাকে না। এটি অবাক হওয়ার কিছু নয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জিন্নার মুখের ওপর জানিয়ে দিল এই সিদ্ধান্ত তারা মানবে না। তাদের সমর্থনে সারা বাংলাদেশে এক সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হলো। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত অনেক মনীষী, যেমন সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো অনেক মনীষী এবং সমাজচিন্তাবিদ ও সংগঠক মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় কলম ধরল। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যা হলো তা ছিল ভাষার পক্ষে তরুণদের বিপ্লব এবং এই বিপ্লবে বুকের রক্ত ঝরালো অনেক তরুণ। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের একটি পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটল আমাদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় পর্বটি শুরু হলো সে দিন থেকে। ভাষা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হলো। লেখক, সাহিত্যিক, কবিরা ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট রূপটি অর্জনের জন্য কলম ধরলেন। চিত্রশিল্পী, সিনেমার পরিচালক, নৃত্যশিল্পী এবং সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে সক্রিয় সকলেই ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার গৌরবজনক ভূমিকাটি অক্ষুণ্ন রেখে এই সংগ্রামে পথ দেখাতে থাকল। এর ফলে মাত্র দুই দশকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সকল শাখায় এক অত্যাশ্চর্য উৎকর্ষের দেখা মিলল, যা প্রভাব ফেলল আমাদের রাজনীতি এবং সমাজচিন্তায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, একুশের পথ ধরেই সংগঠিত হয়েছিল এবং এর সফল পরিসমাপ্তি হলো ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে।

স্বাধীন বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের তৃতীয় পর্বটি শুরু হলো। বাংলাদেশের সংবিধান লেখা হলো বাংলায়। আমাদের জাতীয় সংগীত হলো বাংলায় এবং আমাদের চিন্তাভাবনায় বাংলা একটা বিশাল জায়গাজুড়ে প্রতিষ্ঠা পেল। সেই সংগ্রাম চলল, কিন্তু ১৯৭৫-এর আগস্টে এসে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করার মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক অধ্যায়টির সূচনা হলো সেখানে এসে বাংলা ভাষা একটি সংকটে পড়ল। বাঙালিয়ানার পরিবর্তে ভিন্ন একটি জাতিসত্তার চিন্তা প্রাধান্য পেল যার সঙ্গে পাকিস্তানি চিন্তা-চেতনায় মিলটা পরিলক্ষিত হলো। পুরো আশির দশকজুড়ে বাংলা ভাষা নানা টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেল। রাজনৈতিকভাবে আমরা গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করলাম ১৯৯০ সালের নির্বাচন দিয়ে। কিন্তু ভাষার সংকট আমাদের কাটল না। এটি বরং ঘনীভূত হলো পুঁজিবাদের মাধ্যমে, বিশ্বায়ন ও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের মধ্য দিয়ে। এখন আমাদের ভাষা ব্যবহারে সকল ক্ষেত্রে সংকট। আমাদের মিডিয়া ভাষা একটি সংকর ভাষা। আমরা এখনো উচ্চশিক্ষায় বাংলাকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা দিতে পারিনি।

ভাষা নিয়ে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত আছেই। আমাদের এবারের সংগ্রাম হচ্ছে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির উদ্দেশ্য, আদর্শ ও চেতনাকে আবার ফিরিয়ে আনা। মাতৃভাষাকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া এবং সর্বোপরি বাংলা ভাষাকে নানান বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা। তাহলেই আমরা একুশে শহিদদের প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখাতে পারব।

লেখক: কথাশিল্পী ও অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পরিপ্রেক্ষিত ভাষা আন্দোলন

সমাবেশ-মিছিলে জানা-অজানা শহিদ

আহমদ রফিক

১৯৫২-এর ফেব্রুয়ারি। শহর ঢাকা ভাষা-বিক্ষোভে উত্তাল। সভা, সমাবেশ ও মিছিলে অস্থির, অশান্ত ঢাকা, এমনকি গোটা প্রদেশ। ক্ষুব্ধ জেলা বা মহকুমা শহর থেকে গ্রামের স্কুল প্রাঙ্গণ পর্যন্ত। দূর-উত্তরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে সুদূর দক্ষিণে কক্সবাজার বা পশ্চিমে অখ্যাত মেহেরপুর ছাত্র-জনতার প্রতিবাদে মুখর। বাদ যায়নি পুরো গারো এলাকা বা নালিতাবাড়ি।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত এ আন্দোলনের নায়ক বা ঘটক। পরে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সচেতন শিক্ষিত শ্রেণির অংশবিশেষ। কোথাও শ্রমজীবী মানুষ–বিড়ি শ্রমিক, তাঁত শ্রমিক, হোসিয়ারি শ্রমিক বা অনুরূপ কারখানা শ্রমিক। তারা ছাত্রদের ডাকা সভা-সমাবেশে যোগ দিয়েছে, মিছিলে তাদের সঙ্গে স্লোগান মুখে নিয়ে হেঁটেছে। সারাদেশ সরকারবিরোধী আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ-উত্তেজিত।

ওই আন্দোলন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ও অধিকার আদায়ে সংঘটিত। পাকিস্তানি শাসক শ্রেণির অনমনীয় মনোভাব, উর্দুকে তারা একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবেই। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ থেকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ অন্যান্য শীর্ষ পাকিস্তানি নেতার এ বিষয়ে লৌহকঠিন মনোভাব। তাদের প্রতি অন্ধ সমর্থন জুগিয়ে চলেছে মুসলিম লীগ দলের বাঙালি নেতারা। কারণ বাংলার টানে বিপরীত পথে হাঁটলে পদ ও প্রাপ্তি দুই-ই হারানোর ভয়। তাই তারা কেন হাঁটবে ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় স্বার্থ ও শ্রেণিস্বার্থের বিরুদ্ধে?

আদর্শবাদী ছাত্র-যুবাদের সেসব ভয় নেই, নেই কিছু হারানোর ভয়। আছে শুধু আদর্শের টানে দাবি আদায়ের স্বপ্ন। তাই স্লোগান: 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই, সর্বস্তরে বাংলা চাই।' মিছিলে মিছিলে উচ্চারিত এসব স্লোগান। তারুণ্য বা যৌবন এমন এক বয়স, যখন আদর্শের লড়াইয়ে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়া যায়। তারা তাই দিয়েছিল ১৯৫২ সালের একুশে ও বাইশে ফেব্রুয়ারি।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর স্বতঃস্ফূর্ততা, সাহসী তৎপরতা। কোনো রাজনৈতিক নেতা তাদের নির্দেশ দেননি। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের রাষ্ট্রভাষাবিষয়ক অর্বাচীন বক্তব্য, বিবৃতি বা ভাষণে বা প্রস্তাব গ্রহণের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি ছাত্র-যুবসমাজের বৃহত্তর অংশ প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছে, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে স্লোগান: 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি। এ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা। ঢাকা থেকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে প্রদেশের সর্বত্র, এমনকি অখ্যাত গ্রামের স্কুলে।

তাই প্রথম রক্ত ঝরেছে ঢাকায়, সমাবেশে-মিছিলে। পুলিশ ও আধাসামরিক জোয়ানদের গুলিতে শহিদ হয়েছে। একইভাবে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে শহর থেকে শহরে, গ্রামে-গঞ্জে। ক্ষুব্ধ, উদ্ভ্রান্ত মানুষ প্রতিবাদী মিছিল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেনি। পরিণাম যা-ই হোক না কেন। ঢাকায় আন্দোলন ছাত্রপ্রধান হওয়ার কারণে হল-হোস্টেল বন্ধ ঘোষণা করে আন্দোলনে ইতি টানা সহজ হয়েছিল। কিন্তু ঢাকার বাইরে আন্দোলন ছাত্র-জনতার মিশ্র চরিত্রের হলেও শ্রমিক-জনতার শক্তিমান অবস্থানের কারণে তা অধিকতর সময় সচল থেকেছে।

এখন আলোচনায় বড়ো প্রশ্ন হলো, কারা সেই মিছিল-সমাবেশে হারানো শহিদ, কীভাবে শহিদ, কী-ই বা তাদের নাম-পরিচয়? ঢাকায় মাত্র তো দুই দিন–একুশে ও বাইশে ফেব্রুয়ারি গুলিতে শহিদ ছাত্র-জনতা। তাদের অনেকে জানে, অনেকে অজানা। একাধিক শহিদের নাম-পরিচয়-ঠিকানা জানা যায়নি। এখানে অনুসন্ধানী

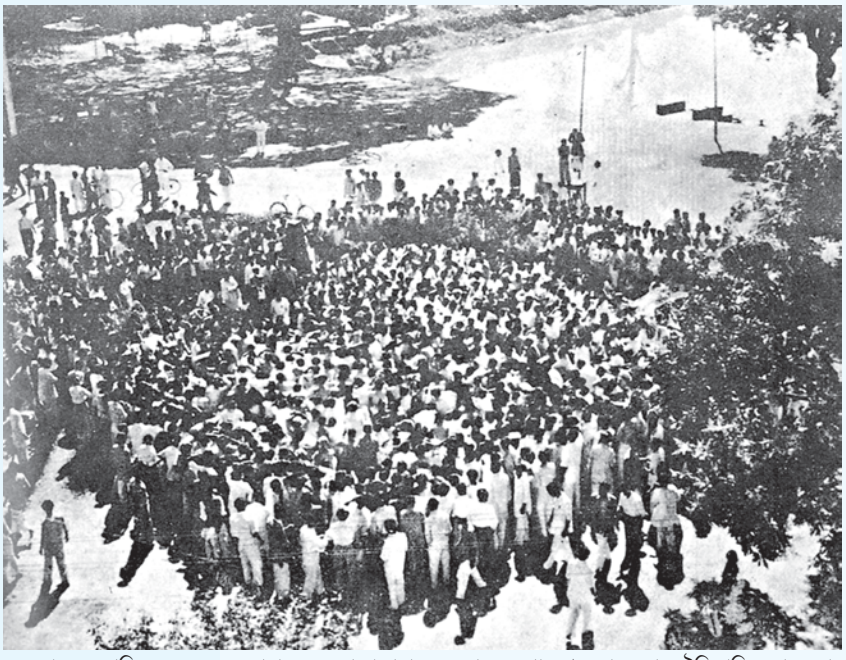

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২: ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রশ্নে পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণের আমতলায় ঐতিহাসিক ছাত্রসভা

সাংবাদিকদের ব্যর্থতা বা উদাসীনতা।

ওরা যেমন কোনো দিন ফিরবে না, তেমনি জানা যাবে না গুটিকয় শহিদের নাম, তাদের পরিচিতি। বোঝাও যাবে না কোন বা কী আকর্ষণে-আবেগে তারা এসে মিছিলে যোগ দিয়েছিল। একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলি চলেছে মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে জমায়েত ছাত্র-জনতার ওপর এবং রাস্তায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের পশ্চিম-দক্ষিণ কোনায় বস্তুত ফুলার রোডে।

মেডিক্যাল হোস্টেলে গুলিবিদ্ধ ও নিহতদের নাম আমরা জানি–রফিক-জব্বার-বরকত-সালাম। জানি না ফুলার রোডে, চৌধুরী পেট্রলপাম্পের পাশে গুলিবিদ্ধ কিশোরটির নাম, যাকে পুলিশ ভ্যানে দ্রুত তুলে নেওয়া হয়। খবরের সূত্র *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার প্রতিবেদন (২২.২.১৯৫২)। কখনো জানা যাবে না কে এই কিশোর? সম্ভাবনা ছিল জানার, প্রকাশিত খবরের সূত্র ধরে অনুসন্ধান করা হলে। একইভাবে অজানা থেকে গেল খেলার মাঠের কোণে গুলিবিদ্ধ যুবকটির পরিচয়, যার পাশে দাঁড়ানো আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র আমিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। পুলিশ কমিশনের রিপোর্টে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। আমরা জানি না শহরের কোন কোণে, কোন বাসায় সন্তানের অপেক্ষায় তাদের মা চাপা কান্নার জলে বুক ভাসিয়েছেন। তাঁদের অপেক্ষা আমৃত্যু, গভীর শোকে যন্ত্রণাদগ্ধ।

পরদিন বাইশে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার, একই রকম ঘটনা। তবু কিছুটা ভিন্ন। পুলিশ গভীর রাতে হাসপাতাল থেকে কয়েকজন শহিদের লাশ ছিনতাই করার কারণে গায়েবানা জানাজা এবং শোকসভা শেষে মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণ থেকে বিশাল মিছিলের শহর পরিক্রমা। এছাড়া স্থানীয় তৎপরতায় রাজপথে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত মিছিল। ঢাকা সেদিন মিছিলের শহর। লাল-কালোর অদ্ভুত মিশ্রণে।

মিছিলে হাঁটা প্রতিটি মানুষের হাতে বা বুকে কালো ব্যাজ, অনেক বাড়িতে উড়ছে কালো পতাকা। মিছিলে লাল বর্ণমালার ফেস্টুন, শহরময় লাল-কালো বর্ণমালার পোস্টার। শহর ঢাকার অফিস-আদালত প্রায় জনশূন্য। দোকানপাট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের অফিস, সিনেমা হল বন্ধ। ঢাকা বেতারে বাঙালি শিল্পীদের ধর্মঘট। আর ঢাকা রেলস্টেশনে রেলের চাকা বন্ধ। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ পরিবহণ ধর্মঘট।

অভাবিত চেহারা শহরের। কিন্তু রাজপথ থেকে গলি পর্যন্ত প্রতিবাদী মিছিল-স্লোগানে মুখর। অন্যদিকে ব্যাপক টহল সশস্ত্র পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর জোয়ানদের। তাদের মুখে ধাতব কাঠিন্য। থেকে থেকে প্রয়োজনহীন গুলিবর্ষণ মিছিলের দিকে। সেদিনের শহিদ হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান, রিকশাচালক আবদুল আউয়াল ও কিশোর ওহিউল্লাহর কথা আমরা জানি, বহু কথিত ও বহুল আলোচিত।

কিন্তু জানি না বাকিদের কথা। তারা কারা? কোন মায়ের সন্তান? যেসব মা দীর্ঘকাল সন্তানের জন্য অতন্দ্র অপেক্ষায় প্রহর গুণেছেন। *দৈনিক আজাদের* সাক্ষ্য: নবাবপুরে পুলিশ বাহিনীর গুলিবর্ষণ শান্তিপূর্ণ মিছিলে। আবারও আজাদেরই সাক্ষ্য : নবাবপুরসহ একাধিক স্থানে পুলিশ ও জোয়ানদের মিছিলে গুলিবর্ষণ। সেই সঙ্গে এমন কোথাও পুলিশ ও জোয়ানদের দেখা গেছে গুলিবিদ্ধ কয়েকজনকে ট্রাকে তুলে নিতে। এমনকি একটি শিশুকে বেয়নেট দিয়ে মাথায় আঘাত করতে দেখা গেছে। তারা কি বেঁচে ছিল?

যুক্তি বলে, না, এদের বেঁচে থাকার কথা নয়। তাহলে ঘটনার ফলাফল কী? বস্তুত শহিদের সংখ্যা বাইশে ফেব্রুয়ারিতে তিনের অধিক এবং তা ছয়ের কম নয়। সংবাদপত্রের ভাষ্যে এমন সংখ্যার সম্ভাবনাই অধিক। আর নাম-ঠিকানা জানা যে শহিদ যুবকটির জন্য কয়েক ফোঁটা অশ্রু ও শোকার্তি প্রকাশ ট্র্যাজেডির মতোই, তার নাম সিরাজুদ্দিন, ঠিকানা বাসাবাড়ি লেন, তাঁতিবাজার।

বংশাল 'মানসী' সিনেমা হলের কাছে মিছিলে গুলিবিদ্ধ, শার্ট-প্যান্ট পরা যে যুবকটির কথা জানা গেল, যার মাধ্যমে জানা গেল তার নাম নান্না মিয়া, পুরান ঢাকার কলতাবাজারের বাসিন্দা। বাইশে ফেব্রুয়ারির গণ-আন্দোলনে নান্না মিয়াও অন্য তরুণ ও যুবকদের মতো ছাত্র হত্যার প্রতিক্রিয়ায়, আবেগে প্রতিবাদ জানাতে মিছিলে নামে। তাঁর কোনো রাজনৈতিক পরিচয়ের তকমা ছিল না।

সেদিনের মিছিল রাজনৈতিক বিচারে মিশ্র চরিত্রের। সেখানে ছিল ক্ষুব্ধ রাজনৈতিক কর্মী নানা দলের, ছিল নির্দলীয় রাজনীতিমনস্ক তরুণ ও যুবক, ছিল ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ জানাতে ক্ষুব্ধ সরকারবিরোধী মানুষ। শেষোক্তদের সংখ্যা কম ছিল না। এরাই কুখ্যাত ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ'-এর ছাপাখানা জুবিলি প্রেস পুড়িয়েছে, রাস্তায় কুকুরের গায় সরকারবিরোধী সরস স্লোগান লেখা পোস্টার সেঁটে দিয়েছে। যাকে বলে ঢাকাই রসিকতা।

আমার বিশ্বাস, সেদিন বাইশে ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সামরিক জোয়ানদের প্ররোচনাহীন গুলিতে মিছিলে হারানো জানা-অজানা শহিদের সংখ্যা ছয়ের অধিক। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তথ্য তেমন কথাই বলে। শহিদ যে যুবকটির কথা দৈনিক পত্রে উঠে আসেনি, বিশেষভাবে যার কথা বলতে এই দীর্ঘ রচনা তার নাম আগেই বলা হয়েছে।

সেই সিরাজুদ্দিনের কথা জানা যায় কলতাবাজারের নান্না মিয়ার কাছ থেকে এবং তা ঘটনার দীর্ঘদিন পর। তিনি তখন মধ্যবয়সি। ঢাকাইয়াদের ঐতিহ্যমাফিক ছোটোখাটো দোকানের আয়ে তাঁর সংসার চলে। ঢাকা স্টেডিয়ামে ছোট্ট এক চিলতে দোকান। তাঁর সঙ্গে পরিচয় কলতাবাজারের আমার এক ঘনিষ্ঠজনের মাধ্যমে, ডাকনাম মিলু। নান্না মিয়ার কথিত ঘটনাটি সত্যি বড়ো ট্র্যাজিক।

মিছিলে হাঁটছিলেন নান্না মিয়া, ভালো নাম ছেরাজুদ্দিন। সেদিনের মিছিল বড়ো উত্তপ্ত, খুব উত্তেজিত একুশের ছাত্র হত্যার কারণে। মিছিলে থেকে থেকে এমন স্লোগানও উঠেছে: 'খুনি নুরুল আমিনের রক্ত চাই- ফাঁসি চাই- বিচার চাই', 'জালিম শাহি ধ্বংস হোক' ইত্যাদি। আর বহু উল্লিখিত তাৎপর্যময় স্লোগান : 'শহিদ স্মৃতি অমর হোক'।

মিছিলের উলটো দিকে ট্রাকে দাঁড়ানো 'মিলিটারি জোয়ান, হাতে রাইফেল, মাঝে মাঝে আগুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে। কথাগুলো নান্না মিয়ার। হঠাৎ লক্ষ করেন পাশে দাঁড়ানো যুবকটির চিৎকার। তার গায়ে গুলি লেগেছে, ঢলে পড়ছে রক্তাক্ত দেহটি। মিছিল হঠাৎ গতিহীন, স্তব্ধ। দু-তিনজন যুবক তাকে ধরে তুলতেই কার যেন প্রশ্নের জবাবে শোনা গেল বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো–'সিরাজুদ্দিন, বাসাবাড়ি লেন, তাঁতিবাজার'। মনে হয় তাকে বাসায় পৌঁছে দেওয়ার আকুতি।

কিন্তু নান্না ভাবছে অন্য কথা। এক্ষুনি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। মিটফোর্ড বা মেডিক্যালে। এর মধ্যে মিছিল সচল হয়ে উঠেছে, তার আগেকার গতি-ছন্দ ফিরে পেয়েছে। সেই টানে নান্নাও এগিয়ে চলেছে। পেছনে পড়ে থাকে তাঁতিবাজারের গুলিবিদ্ধ যুবক সিরাজুদ্দিন এবং তাকে ধরে মিছিল থেকে সরিয়ে নেওয়া কয়েকজন তরুণ। ওরা লক্ষ্মীবাজারের ছেলে, রাজনৈতিক কর্মী।

মিছিলে চলা নান্না এখন অন্যমনস্ক। তাঁর চোখে ভাসছে গুলিবিদ্ধ সিরাজুদ্দিনের যন্ত্রণাভরা বিবর্ণ মুখ। কোথায় নিয়ে গেছে ওরা সিরাজুদ্দিনকে, কোন হাসপাতালে? মারা যাবে না তো সিরাজুদ্দিন? নান্না আরো ভাবছে, সে কেন থেকে গেল না ওই ছেলেদের সঙ্গে, একটা রিকশা বের করে এনে রক্তাক্ত যুবকটিকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিতে!

একবার মনে হলো, ফিরে যাই। কিন্তু মিছিলের দ্রুত চলার ছন্দ, প্রতিবাদীদের কণ্ঠে স্লোগানের গর্জন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফিরে যাওয়ার কথা মন থেকে হারিয়ে গেল। সেদিনের ওই মিছিলের সঙ্গে একাকার তার পথচলা। সারাটা দিন কেটে গেল মিছিলে, স্লোগানে ডুবে গিয়ে। মাঝেমধ্যে কানে ভাসছে সিরাজুদ্দিনের নিস্তেজ কণ্ঠস্বর: 'বাসাবাড়ি লেন'...।

ঢাকা স্টেডিয়ামের ছোট্ট দোকানি ছেরাজুদ্দিন ওরফে নান্না মিয়া বিষণ্ন-উদাস কণ্ঠে কথাগুলো বলেছিলেন আমাকে। মিছিলে হারানো এক শহিদ যুবকের কথা। আমার ধারণা, সেদিন বাইশে ফেব্রুয়ারি হয়ত গুলিতে এমন একাধিক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে। ওই দিন সাকুল্যে ছয়জনেরও বেশি ভাষাশহিদ। তিনজনের বেশি কারো নাম-পরিচয় আমরা জানি না। জানি না তৎকালীন উদাসীন সাংবাদিকতার কারণে। তাই হারিয়ে গেছেন একাধিক ভাষাসংগ্রামী নামহীন, পরিচয়হীন অন্ধকারে।

নান্নাকে আমার শেষ প্রশ্ন ছিল: এত দিন এ ঘটনার কথা কাউকে বলেননি কেন? তাঁর নিস্পৃহ জবাব: 'কেউ তো জিগায় নাই।' এমন অদ্ভুত কথার পিঠে কী-ই বা বলা যেতে পারে? ভাগ্যিস, মিলু বলেছিল, আমার চেনা একজন বাইশের মিছিলে ছিল, তার কাছে কিছু খবর মিলতে পারে। তাই স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে নান্নার সঙ্গে কথা, মাধ্যম মিলু।

লেখক: কবি, গবেষক, ভাষাসংগ্রামী

শহিদ দিবস থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সৌরভ সিকদার

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। মায়ের ভাষাকে রক্ষার জন্য রাজপথে আন্দোলন হয়। পাকিস্তানি সরকারি বাহিনীর গুলিতে প্রাণদান করে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা। সালাম-বরকত-রফিক-শফিক-জব্বার আরো কত নাম না-জানা সেসব শহিদের আত্মত্যাগে আমরা ফিরে পাই আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলা। জাতিসংঘের স্বীকৃতির ফলে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে সারাবিশ্বে। একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কী করে হলো– সে আলোচনা করা যাক।

আমাদের বাংলা ভাষার জন্য এক দারুণ ব্যাপার ঘটল সেদিন। দিনটি ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ইউনেস্কোর ৩০তম অধিবেশন বসে। ইউনেস্কোর সেই সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব পাস হয়। ফলে পৃথিবীর সব ভাষাভাষীর কাছে একটি উল্লেখযোগ্য দিন হিসেবে ২১শে ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি পায়। বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষা লাভ করে বিশেষ মর্যাদা। ঠিক পরের বছর ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে পৃথিবীর ১৮৮টি দেশে এ দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন শুরু হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

২১শে ফেব্রুয়ারি বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পেছনের ঘটনা জানতে হলে আমাদের একটু পেছনে ফিরে তাকাতে হবে। আমরা জানি, একুশে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনের দিন। প্রতিবছরই মর্যাদার সঙ্গে বাংলাদেশসহ বিশ্বে অনেক দেশে দিনটি পালিত হয়ে আসছে। এমনকি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্যে 'বাংলা ভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে এই দিনটি।

২১শে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করার আগে, এই দিনটি মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে দাবি শোনা যায়, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও এ দাবি তোলা হয়। এ রকম আরো কিছু ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের কথা আমরা জানতে পারি। তবে এ বিষয়ে প্রথম সফল উদ্যোক্তারা হলেন কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষা-প্রেমিকগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী প্রথমে ১৯৯৮ সালের ২৯শে মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' নামে একটি দিবস ঘোষণার প্রস্তাব উপস্থাপন করে। সেখানে তাঁরা বলেন, 'বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেটা ছিল তাদের ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। আজকের পৃথিবীতেও অনেক জাতি-গোষ্ঠীর ভাষাও একই সমস্যা ও বিপদের মধ্যে আছে।' কাজেই মাতৃভাষা দিবসের দাবিটি খুবই ন্যায়সংগত।

মাতৃভাষা-প্রেমিকগোষ্ঠীর এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন ৭ জাতি ও ৭ ভাষার ১০ জন সদস্য। তাঁরা হলেন অ্যালবার্ট ভিনজন ও কারমেন ক্রিস্টোবাল (ফিলিপিনো), জ্যাসন মোরিন ও সুসান হজিন্স (ইংরেজি), ড. কেলভিন চাও (ক্যান্টনিজ), নাজনীন ইসলাম (কা-চি), রেনাটে মার্টিনস (জার্মান), করুণা জোসি (হিন্দি) এবং রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম (বাংলা)। জাতিসংঘ মহাসচিবের অফিস থেকে এই পত্রপ্রেরকদের জানিয়ে দেওয়া হয়; বিষয়টির জন্য নিউইয়র্কে নয়, যোগাযোগ করতে হবে প্যারিসে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সংগঠন ইউনেস্কোর সঙ্গে। জাতিসংঘে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা হাসান ফেরদৌসেরও এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা ছিল সে সময়।

এরপর প্রায় এক বছর পেরিয়ে যায়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি ইউনেস্কো। কানাডা প্রবাসী বাঙালি আবদুস সালাম ও রফিকুল ইসলাম (যাঁরা মাতৃভাষা-প্রেমিকগোষ্ঠীর সদস্য) এ বিষয়ে ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন। প্রথমে টেলিফোনে এবং পরে চিঠিতে। ১৯৯৯ সালের ৩রা মার্চ ইউনেস্কো সদর দপ্তরের ভাষা বিভাগের কর্মকর্তা আন্না মারিয়া রফিকুল ইসলামকে একটি চিঠিতে জানান যে '২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার তোমাদের অনুরোধটি বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।' কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার একজন কর্মকর্তার কাছে এই প্রথম বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

আন্না মারিয়া আরো জানান, 'বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই, ইউনেস্কোর পরিচালনা পরিষদের কোনো সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে সভায় এটি তুলতে হবে।' ইউনেস্কো সদর দপ্তরের ভাষা বিভাগের কর্মকর্তা মারিয়া রফিকুল ইসলামকে ইউনেস্কো পরিচালনা পরিষদের কয়েকটি সদস্য দেশের ঠিকানাও পাঠিয়ে দেন। এতে বাংলাদেশ, ভারত, কানাডা, ফিনল্যান্ড এবং হাঙ্গেরির নাম ছিল। ইউনেস্কো সাধারণ পরিষদে বিষয়টি আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হলে কয়েকটি সদস্য দেশের পক্ষে প্রস্তাব পেশ করা জরুরি। তখন হাতে সময় ছিল খুবই কম। কেননা অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সাধারণ পরিষদের সভা বসবে।

কানাডা থেকে রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিষয়টি রাষ্ট্রের জন্য গর্বের বিষয় মনে করে মন্ত্রণালয় অতি দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর অফিসে অনুমতি চেয়ে নোট পাঠায়। বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সময়স্বল্পতার বিষয়টি উপলব্ধি করেন। তিনি সব ধরনের জটিলতা উপেক্ষা করে নথি অনুমোদনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ছাড়াই ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে প্রস্তাবটি পাঠিয়ে দেন সরাসরি। ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে সংক্ষেপে বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশনের পক্ষে এর সচিব অধ্যাপক কফিলউদ্দিন আহমদের স্বাক্ষরিত সেই প্রস্তাবটি প্যারিসে পৌঁছে যায়।

তখন ইউনেস্কোর নির্বাহী পরিষদের ১৫৭তম অধিবেশন এবং ৩০তম সাধারণ সম্মেলন ছিল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের বিষয়টি নিয়ে ইউনেস্কোতে দুটি সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমত, ইউনেস্কো ভেবেছিল, এমন একটা দিবস পালন করতে গেলে ইউনেস্কোর বড়ো অঙ্কের টাকাপয়সা প্রয়োজন হবে। প্রতিবছর অনেক টাকাপয়সা খরচের কথা ভেবে প্রথমেই প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। একই সঙ্গে ইউনেস্কো মহাপরিচালক International Mother Language Day নয়, International Mother Tongue Day নামে একে অভিহিত করতে সচেষ্ট হন। মহাপরিচালক এ জন্য এক লাখ ডলারের ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করেন এবং দুই বছর পর নির্বাহী পরিষদের ১৬০তম অধিবেশনে একটি সম্ভাব্যতা জরিপের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরার আদেশ দেন।

এর ফলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার বিষয়টি আটকা পড়ে। প্রস্তাবটি কার্যকর হতে কমপক্ষে দুই বছর সময় লাগবে বলে মনে করা হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক। শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ইউনেস্কো অধিবেশনে যোগদানকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা। তিনি অধিবেশনে বক্তব্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য পৃথিবীর ১৮৮টি জাতির সামনে তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠক করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পক্ষে অভিমতও গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এমনকি উপস্থিত সদস্যদের বোঝাতে সক্ষম হন, দিবসটি পালন করতে প্রকৃতপক্ষে ইউনেস্কোর এক ডলারও লাগবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ নিজেরাই নিজেদের মাতৃভাষার গুরুত্ব আলোচনা ও জয়গান গাইতে গাইতে দিনটি পালন করবে।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ডকুমেন্টেশন পুস্তিকায় সদস্যসচিব ড. মোহাম্মদ হাননান লিখেছেন, 'শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক একই সঙ্গে কতকগুলো ব্যক্তিগত কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও চালান। এক রাতে তিনি পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের নেতার সঙ্গেও একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। প্রস্তাবটিতে পাকিস্তানের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কারণ, যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্ন ঘিরে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি সংঘটিত হয়েছিল, তাতে পাকিস্তানের মনোভাবে অবশ্যই না-বাচক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা ছিল। এছাড়া অন্যান্য মুসলিম দেশ, বিশেষ করে সৌদি আরবের সমর্থনের ক্ষেত্রেও সে দেশের ইতিবাচক ভূমিকা প্রভাব ফেলতে পারত। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানে সামরিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ফলে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী সে বছর ইউনেস্কো সম্মেলনে যাননি, পাকিস্তানি দলের নেতৃত্ব দেন পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব। বৈঠকে এ এস এইচ কে সাদেক আবিষ্কার করেন, পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব একসময় তাঁর অধীনে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে কাজ করেছেন। আরো মজার বিষয়, পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব বাংলায় চমৎকার কথা বলতে পারেন। ফলে এ বৈঠক খুবই সফল হলো। তিনি প্রস্তাবটি সমর্থনের আশ্বাস দেন।... ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিয়েও কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় তাদের আপত্তি ছিল না। তবে তারা ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলোর কাছে শিক্ষামন্ত্রী যুক্তি ও আবেগের সঙ্গে এই বিষয়টি তুলে ধরেন যে পৃথিবীতে বাঙালিরা মাতৃভাষার অধিকারের জন্য রক্ত দিয়েছে। সেটা ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে। তখন ইউরোপীয়রা ব্যাপারটা বুঝতে পারে।'

এভাবে দীর্ঘ প্রক্রিয়া পার হওয়ার পর ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশ ফেব্রুয়ারি লাভ করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা। ইউনেস্কোর ঐতিহাসিক সেই অধিবেশনে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালনের মূল প্রস্তাবক ছিল বাংলাদেশ এবং সৌদি আরব। আর সমর্থন করেছিল আইভরি কোস্ট, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কমোরোস, ডোমিনিকান রিপাবলিক, পাকিস্তান, ওমান, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপিন, বাহামাস, বেনিন, বেলারুশ, গাম্বিয়া, ভারত, ভানুয়াতু, মাইক্রোনেসিয়া, রুশ ফেডারেশন, লিথুয়ানিয়া, মিসর, শ্রীলঙ্কা, সিরিয়া ও হন্ডুরাস।

১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভ শুধু বাংলা ভাষার বিশ্ববিজয় নয়; পৃথিবীর সব মাতৃভাষার জয়।

লেখক: ভাষাতত্ত্ববিদ. সাহিত্যিক ও অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কম্পিউটারে বাংলা প্রচলনের ৩৪ বছর

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, যার বিস্তৃতি আজ শুধু বইয়ের মলাটেই সীমাবদ্ধ নেই। প্রযুক্তির উৎকর্ষে এখন এর বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়েছে ইন্টারনেট ভুবনেও। কম্পিউটারে এখন আমরা বাংলা ভাষায় লিখছি, পড়ছি এবং আমাদের মনের ভাব বিনিময়ও করছি। কিন্তু এটারও একটি ইতিহাস রয়েছে। ইতিহাসটি হচ্ছে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রচলনের ইতিহাস। ১৯৮৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি আমেরিকা প্রবাসী প্রকৌশলী সাইফুদ্দাহার শহীদ তার মায়ের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেন। ৩৪ বছর আগে যে চিঠি তিনি লিখেছিলেন তা হাতে লেখা ছিল না, তা ছিল কম্পিউটারে টাইপ করা। কম্পিউটারে বাংলা টাইপ করে মায়ের কাছে প্রথম চিঠি লিখেছিলেন তিনি। ১৯৮৫ সালে কম্পিউটারে নিজের তৈরি শহীদ লিপি প্রোগ্রাম ব্যবহার করে বাংলায় লেখার কারণে সাইফুদ্দাহার শহীদ এই অ্যাপ্লিকেশনটির নাম দিয়েছিলেন 'শহীদ লিপি'। পরে বাংলাদেশে এই অ্যাপ্লিকেশনটির ব্যবহার শুরু করা হয়। বর্তমানে 'শহীদ লিপির' প্রচলন না থাকলেও কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহারে 'শহীদ লিপির' ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'শহীদ লিপির' মাধ্যমেই কম্পিউটারে বাংলা ভাষার বিস্তার ঘটে। সেই চেষ্টার ফসল হিসেবে এক পর্যায়ে আবির্ভূত হয় ওয়েবভিত্তিক বাংলা অ্যাপ্লিকেশন এবং সফটওয়্যার। বর্তমানে ইন্টারনেট ও কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। গুগলে বাংলা অনুসন্ধানে তথ্যের পাশাপাশি এখন ছবিও নিমিষেই হাজির হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগের সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম ফেসবুকে এখন অনেকের অ্যাকাউন্ট সম্পূর্ণ বাংলায়। আর ইউনিকোডভিত্তিক বাংলা সংবাদপত্রগুলো চালু হওয়ার পর ওয়েবে বাংলা আগের তুলনায় বেশি পাওয়া যাচ্ছে। আর তা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

প্রতিবেদন: জেসিকা হোসেন

ভাষা আন্দোলনের প্রথম উপন্যাস

বীজাঙ্কুর

খালেক বিন জয়েনউদদীন

মাতৃভাষা কেড়ে নেবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুবই কম। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের শুরুতে। তখন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সৃষ্টির ঘোষণা হলে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন দেখা দেয়। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন প্রস্তাব করেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হওয়া উচিত। আজগুবি প্রস্তাব– উর্দু কখনোই যারা পাকিস্তানের স্বাধীনতা চেয়েছিল তাদের কোনো অংশের মানুষের মাতৃভাষা ছিল না।

খামখেয়ালি প্রস্তাবের প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেন পূর্ব বাংলার মানুষ। ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ, তমুদ্দুন মজলিস, তরুণ মুজিব, ছাত্রলীগ ও মাতৃভাষা প্রেমিক বাঙালি জনগণ। তারা বাংলা ভাষার সূচনাপর্বে প্রত্যক্ষ আন্দোলন করেন। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের কথা আমরা সকলেই জানি। শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীরা প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে গ্রেফতার ও আহত হয়েছিলেন। বাহান্নর মহান ভাষা আন্দোলনে তো আমাদের প্রাণ দিতে হয়। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা পায় প্রাণের বিনিময়ে। বাংলাদেশের যে অভ্যুদয় তার মূলে রয়েছে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা ও শক্তি।

আটচল্লিশ ও বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের নানা ঘটনা বাঙালির ইতিহাসের আকর। বাঙালির জেগে ওঠার সেই ইতিহাস একদিনে রচিত হয়নি। ইতোমধ্যে ভাষা আন্দোলনের সেই ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে শত শত ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এসব গ্রন্থ কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের। মাতৃভাষার জন্য বাঙালির সেই আত্মত্যাগের কাহিনি সেসব গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। ভাষা শহিদদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে স্মৃতির মিনার 'জাতীয় শহিদমিনার'।

আমরা জানি একুশের প্রথম সংকলন (১৯৫৩) সম্পাদনা করেন কবি হাসান হাফিজুর রহমান, প্রথম কবিতা লেখেন মাহবুব উল-আলম চৌধুরী, নাটক লেখেন জেলখানা থেকে একাত্তরের শহিদ মুনীর চৌধুরী, গান লেখেন প্রকৌশলী মোশারেফ আহমদ, উপন্যাস লেখেন চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান। এগুলো হলো: *একুশে ফেব্রুয়ারি, এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে, কবর, মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিলো ও আরেক ফালগুন*। একুশের এসব সৃষ্টি সর্বজন স্বীকৃত এবং ইতিহাসের পাতায় তা লিপিবদ্ধ।

কিন্তু মহান ভাষা আন্দোলনের সত্তর বছর পরে জানা গেলো একুশের প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন কুমিল্লা জেলা রাজস্ব অফিসের কেরানি ও সদর উপজেলার রসুলপুর গ্রামের আবদুল অদুদ চৌধুরী।

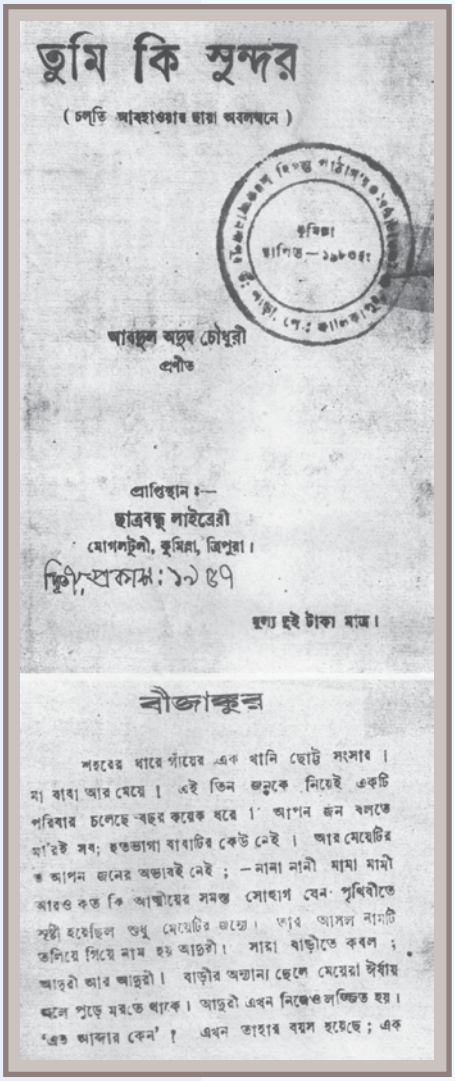

তুমি কি সুন্দর

(চলতি আবহাওয়ার ছায়া অবলম্বনে)

আবদুল অদুদ চৌধুরী
প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান :—
ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী
মোগলটুলী, কুমিল্লা, ত্রিপুরা।
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৫৭

মূল্য দুই টাকা মাত্র।

বীজাঙ্কুর

শহরের ধারে গাঁয়ের এক খানি ছোট্ট সংসার। মা বাবা আর মেয়ে। এই তিন জনকে নিয়েই একটি পরিবার চলেছে বছর কয়েক ধরে। আপন জন বলতে মা'রই সব; হতভাগা বাবাটির কেউ নেই। আর মেয়েটির ও আপন জনের অভাবই নেই; —নানা নানী মামা মামী আরও কত কি আত্মীয়ের সমস্ত সোহাগ যেন পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছিল শুধু মেয়েটির জন্যে। তার আসল নামটি ভুলিয়ে গিয়ে নাম হয় আদুরী। সারা বাড়ীতে কেবল; আদুরী আর আদুরী। বাড়ীর অন্যান্য ছেলে মেয়েরা ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরতে থাকে। আদুরী এখন নিজেও লজ্জিত হয়। 'এত আদ্দার কেন'! এখন তাহার বয়স হয়েছে; এক

পাকিস্তান সরকার 'বীজাঙ্কুর' নিষিদ্ধ করলে 'তুমি কি সুন্দর' নামে সংস্করণ হয়

জহির রায়হান রচিত আরেক ফালগুন (১৯৬৯) প্রথম উপন্যাস নয়। আবদুল অদুদ চৌধুরী বিরচিত 'বীজাঙ্কুর'ই একুশের প্রথম উপন্যাস। এটি দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয় কুমিল্লা থেকে ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ আরেক ফালগুনের ১২ বছর পূর্বে। প্রকাশক এসএস আকতার চৌধুরী। দ্বিতীয়বার ছাপার সময় উপন্যাসটির নামকরণ করা হয় 'তুমি কি সুন্দর' নামে। কিন্তু ভেতরের মূল আখ্যান হুবহু ঠিক রাখা হয়। শিরোনাম পালটানোর কারণ সরকারের নিষিদ্ধ ঘোষণা, লেখকের ওপর গ্রেফতার পরোয়ানা এবং এক পর্যায়ে আবদুল অদুদকে চাকরিচ্যুত করা। নিজেকে রক্ষার জন্য বইটি হজরত মুহাম্মদ সা. কে উৎসর্গ করা হয়েছে।

উপন্যাসটি এতদিন কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলা আনন্দপুর উত্তরপাড়াস্থ দশ দিগন্ত পাঠাগারে রক্ষিত ছিল। এটির ভেতরে ভাষা আন্দোলনের গান দেখে প্রথমে উদ্ধার করেন কুমিল্লা বেতার কেন্দ্রের নাট্য প্রযোজক সৈয়দ মোহাম্মদ বিল্লাল। উপন্যাসটির পাতা লালচে। উলটালেই ছিঁড়ে যেতে পারে। এক টানা আমি এটি পড়ে ফেলি। এক অন্ধ গায়ক মতিনের কাহিনি। মতিন মাতৃভাষা বাংলার গান গেয়ে ভাষা আন্দোলনের সময় প্রাণ দেয়। উপন্যাসটির অনুষঙ্গে রয়েছে গ্রামীণ পটভূমি। রেহানার ভালোবাসার গল্প। আরো আছে মিনু, মাহমুদ, নয়নী, পারভিন, শ্যামল, নাছির, মনিরের ঘটনা এবং রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য প্রসঙ্গ। ঘটনার বর্ণনায় নজরুল ও জসীমউদদীনের কবিতার প্রয়োগ এবং বিন্যাসে মধুসূদন, শরৎচন্দ্র, হেনরিয়েট ও হিটলারের নাম তাঁর সাহিত্যজ্ঞানের পরিধির কথা জানিয়ে দেয়। আরো আছে '৫০-এর মন্বন্তরের ছবি। উপন্যাসের গাথুনি সহজ-সরল। ভাষায় কোনো কাঠিন্য নেই। প্রচণ্ডভাবে রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন অদুদ।

অদুদ ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

গলায় হারমুনিয়াম ঝুলিয়ে বেরিয়ে পরল রাস্তার সাধারণ অন্ধ ভিখারীর বেশে লাঠি ঠুকে ঠুকে। ছেলেমেয়ের দলও চলছিল পাঠশালায়! ঘিরে ধরল, 'এই ফকির আমাদের একটা গান শুনাও! তুমি যেখানে যাবে সেখানে পৌঁছিয়ে দেব'। এগিয়ে চলে গান গাইতে গাইতে। রাস্তার লোকেরা হা করে চেয়ে থাকে; একি! যেন হেমেলিনের বংশীবাদক।

তখন পূর্ব পাকিস্তানের ঘরে ঘরে চলছিল রাষ্ট্র ভাষার সমালোচনা, মোল্লাদলের কেউ কেউ সমর্থন করল উর্দু। একজন আর একজনকে বুঝাতে লাগল, 'রাষ্ট্র ভাষা যদি উর্দু হয় তা হেটওয়ালা ইংরেজি পড়ুয়াদের কোনো দামই থাকবে না! আর এই অবহেলিত লম্বা কোর্তা ওয়ালারাই হবে রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড! –অন্য দিকে বলতে লাগল, 'হে ইমান ওয়ালো

না ফেরার দেশে আমজাদ হোসেন

একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার, নাট্যকার ও সাহিত্যিক, যিনি দেশ ও দেশের বাইরে সর্বত্র পরিচিত– তিনি হলেন আমজাদ হোসেন। দেশ, সমাজ ও পরিবারের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির চিত্র অনবদ্য ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে তিনি তাঁর লেখনি আর পর্দায় সফলভাবে তুলে ধরেন।

আমজাদ হোসেনের জন্ম ১৯৪২ সালের ১৪ই আগস্ট, জামালপুরে। শৈশব থেকেই তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় এসে সাহিত্য ও নাট্যচর্চার সঙ্গে জড়িত হন। শুরুটা ছিল ১৯৬১ সালে মহিউদ্দিন পরিচালিত *তোমার আমার* চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। আমজাদ হোসেনের লেখা নাটক *ধারাপাত* নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন সালাহউদ্দিন। এতে তিনি নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি নিজেই চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, নাম *জুলেখা*। তাঁর পরিচালিত ব্যাপক দর্শকপ্রিয় চলচ্চিত্র হচ্ছে– *নয়নমনি, গোলাপী এখন ট্রেনে, সুন্দরী, কসাই, জন্ম থেকে জ্বলছি, দুই পয়সার আলতা, সখিনার যুদ্ধ, ভাত দে, হীরামতি, প্রাণের মানুষ, সুন্দরী বধূ, কাল সকালে, গোলাপী এখন ঢাকায়, গোলাপী এখন বিলেতে* ইত্যাদি। তিনি একাধারে একজন চলচ্চিত্র পরিচালক, গীতিকার ও সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত। *গোলাপী এখন ট্রেনে* ও *ভাত দে* চলচ্চিত্রের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৯৩ সালে শিল্পকলায় অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান একুশে পদকে ভূষিত করে। এছাড়া সাহিত্য রচনার জন্য তিনি ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালে দুইবার অগ্রণী শিশু সাহিত্য পুরস্কার ও ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ব্যতিক্রমধর্মী এই চলচ্চিত্র নির্মাতা তাঁর কর্মজীবনে ১২টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং ৬টি বাচসাস পুরস্কার অর্জন করেছেন। তাঁর লেখা কাহিনি নিয়ে ১৯৭০-এ জহির রায়হান নির্মাণ করেন সাড়া জাগানো ছবি *জীবন থেকে নেয়া*। চলচ্চিত্র ছাড়াও টিভি নাটক *জব্বর আলী* নির্মাণ ও এতে অভিনয় করে ছোটো পর্দার দর্শকদের কাছেও আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তা লাভ করেন বরেণ্য এই ব্যক্তিত্ব।

তিনি অর্ধশতাধিকেরও বেশি নাটক, টেলিফিল্ম ও ধারাবাহিক নির্মাণ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে– *নিরক্ষর স্বর্গে, দ্রৌপদী এখন ট্রেনে, দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভালোবাসা, আমি এবং কয়েকটি পোস্টার, ডালপালা, ফুল বাতাসী, রাম রহিম, আগুনে অলঙ্কার, ঝরা ফুল, শেষ রজনী, মাধবী সংবাদ* ইত্যাদি। এছাড়া তিনি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস, জীবনী, ইতিহাস, কিশোর উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, ফিকশন, রচনাসমগ্র এবং কিশোরসমগ্র রচনা করে গেছেন।

বিখ্যাত এই চলচ্চিত্রকার গত ১৮ই নভেম্বর ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে নভেম্বর আমজাদ হোসেনের উন্নত চিকিৎসার খরচের দায়িত্ব নিলে তাকে ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু বিখ্যাত এই চলচ্চিত্রকার ১৪ই ডিসেম্বর বেলা ২টা ৫৭ মিনিটে না ফেরার দেশে চলে যান। তিনি তাঁর সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

প্রতিবেদন: মিতা খান

মোসলমান ভাইগণ! তোমরা এই কথা নিশ্চয় জান যে আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু ভাষীদের মধ্যেই যতসব বুজর্গান পীর আওলিয়ার জন্ম হয়েছে কিন্তু বাংলায় তা কোনদিন হয় নাই–হবেও না। আর আরবী হরফে অর্থাৎ যে হরফ দিয়ে কোরান লেখা হয়েছে সেই হরফেই উর্দ্দু ভাষা লেখা হয়। উর্দ্দুকেই তোমরা সমর্থন কর কয়েকটা হিন্দু ঘেষা নেংটা ছাত্রের কথায় বিভ্রান্ত হইওনা। ধর্ম ভীরু পাকিস্তানী মোসলমানদের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এল প্রায়। এমনি সময় ছোট ছোট ছেলেদের দলে মিশে গান গেয়ে চলল মতিন...।

যে ভাষাতে গান গাহিয়া ঘুম পাড়াতেন মা–
নমিঃ মোরা সেই ভাষারে চুমি ভাষার পা।
এই ভাষাকে ভুলিয়ে দিতে বুলেট যদি আসে
বক্ষ পেতে দিব মোরা ফুলের মতো হেসে।

এবারে উপন্যাসটি নিষিদ্ধ হবার কাহিনি বলা প্রয়োজন। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন শেষ হয়েছে। রেশ শেষ হয়নি। যার ছোঁয়া পূর্ব বাংলার সর্বত্র। অদুদ কুমিল্লা বসে এটি লিখে খুব সম্ভব '৫৪ সালে ছাপলেন। তখন তিনি কুমিল্লা রাজস্ব অফিসে চাকরি করেন। উপন্যাস নিষিদ্ধ হলো, গ্রেফতার পরোয়ানা জারি হলো এবং চাকরি গেল। এক পর্যায়ে সরকারকে মোচলেকা দিয়ে কুমিল্লা আদালত থেকে মুক্তি পেলেন। চাকরিও পেলেন নাসিরনগর তহশিল অফিসে। সাতান্নতে তিনি কুমিল্লার নামজাদা প্রকাশক সেকেন্দার আলীর সহায়তায় *বীজাঙ্কুরের* আখ্যানভাগ ঠিক রেখে 'তুমি কি সুন্দর' নামে প্রকাশ করেন। কিন্তু মফস্বল ও পর্দার আড়ালে থাকার কারণে অনালোচিত থেকে গেছেন তাঁর জীবদ্দশায়।

এবার ভাষা আন্দোলনের প্রথম ওপন্যাসিক আবদুল অদুদের কথা। আবদুল অদুদ ছিলেন একজন রাজনৈতিক সচেতন মানুষ। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কুমিল্লার সদর উপজেলার রসুলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আব্দুল হাকীম চৌধুরী। বাহান্নতে অদুদ ছিলেন টগবগে যুবক। সেসময় তিনি কুমিল্লার ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন এবং ছড়া, কবিতা ও গান লিখেছেন। একাত্তরে তিনি ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ শেষে চাকরিতে যোগদান করতে গেলে জেলা রাজস্ব কর্মকর্তার সাথে বিরোধ বাঁধে। স্বপদে যোগদানের পরিবর্তে এক পর্যায়ে তাকে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করতে হয়। তাঁর দুর্ভাগ্য, অবসরকালীন বেতন/ভাতা কিছুই পাননি। মুক্তিযুদ্ধের সনদ থাকা সত্ত্বেও পাননি কোনো ভাতা। নির্লোভ ও নির্মোহ এই মানুষটি সারাজীবনই পর্দার আড়ালে থেকে গেছেন।

জীবনের অন্তিমে তাঁর ব্রেইন স্ট্রোক হয়। ১২ বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। দুঃখে-কষ্টে জর্জরিত এই মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ে প্রথম ঔপন্যাসিক আবদুল ওদুদ চৌধুরী ২০০৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর লোকান্তরিত হন।

জীবন সংগ্রামে আবদুল অদুদ ছিলেন পরাজিত সৈনিক। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েও স্বাধীনতার স্বাদ পাননি। তাঁকে লড়তে হয়েছে '৫২ ও '৭১-এর হায়েনাদের সাথে। অসম্ভব সম্ভাবনা ছিল তাঁর জীবনের। কুমিল্লার এত কাছে ঢাকা, অথচ ঢাকার হাওয়া তাঁর গায়ে লাগেনি। তিনি পরিবেশের প্রভাবকে অগ্রাহ্য করে ঠকেছেন এবং আমাদের ঠকিয়েছেন। তবে একটি উপন্যাসেই তিনি সাহিত্য প্রতিভার স্ফূরণ ঘটিয়েছেন, তাঁর মূল্যায়ন না করে উপায় নেই। তাঁর বিরচিত 'বীজাঙ্কুর' বর্তমান পাঠকদের দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য খুব শিগগিরই ঢাকার অন্যতম প্রকাশনী সংস্থা জোনাকী থেকে বের হবে। আর তখনই মনোজ্ঞ পাঠক বিচার করবেন অদুদের 'বীজাঙ্কুর' কেমন ছিল।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

অমর একুশের চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে

মিজানুর রহমান মিথুন

আবারও ফিরে এসেছে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি। এ মাসের একুশ তারিখে আমরা ফিরে পেয়েছিলাম বাংলায় কথা বলার স্বাধীনতা। তাই একুশ আমাদের জাতীয় চেতনার ভিত্তিমূল। আমাদের অস্তিত্বের অহংকার। একুশ শুধু কথা বলার অধিকার এনে দেয়নি, আমাদের সাংস্কৃতিকভাবেও সচেতন এবং জাগ্রত করেছে। একুশ বাঙালি সাহিত্য, সংস্কৃতি, লোকাচার ও জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের অন্যতম প্রেরণা। এ কথায় বলা যায়, একুশ আমাদের সামগ্রিক পরিচয়বাহক। বাঙালির বাংলা ভাষার জন্য এই আত্মত্যাগের বীরত্বগাঁথা বাংলাদেশের ইতিহাসে শুধু নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

একুশের ঐতিহাসিক ঘটানার প্রেক্ষাপট সুদীর্ঘ। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভেঙে দুটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় হয় ১৯৪৭ সালে। প্রায় শতভাগ বাংলাভাষীর পূর্ব বাংলা আর বারোশ মাইল দূরের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও উর্দুভাষীদের নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান। দেশভাগের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর আধিপত্য বিস্তার শুরু করে। রাষ্ট্রের শাসনভারও তাদের হাতে। তারা শুরু করে শোষণ-বঞ্চনা। প্রথমত তারা আঘাত হানে বাঙালি জাতির ভাষা বাংলার ওপর। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় করাচিতে। প্রথম দিনই জানানো হয়, উর্দু এবং ইংরেজি হবে সংসদের ভাষা। তখন পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশের মাতৃভাষা বাংলা। সেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে এভাবে অবহেলা করা হয়। বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস দলীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি তা নিয়ে সংসদে সাধারণ আলোচনা হয়। প্রস্তাবটি যে শুধু নাকচ হয়, তা নয় এ প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যদের ভর্ৎসনা শুনতে হয়। এখানেই শেষ নয়। খাজা নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সদস্যরাও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এবং ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে আক্রমণ করে বক্তব্য দেন।

পাকিস্তানের রাজধানী করাচির এই ঘটনার খবর ঢাকায় পৌঁছার সাথে সাথেই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বাঙালি যুব সমাজ বুঝতে পারল যে বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। এর প্রতিবাদে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। তখনকার উদীয়মান রাজনীতিবিদ এবং পরবর্তীকালে বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নবগঠিত ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস যৌথভাবে ২রা মার্চ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। পরিষদের সভায় ১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' ঘোষণা করা হয়। ঐদিন সারাবাংলায় প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। বঙ্গবন্ধু, তমদ্দুন মজলিসের প্রধান আবুল কাশেমসহ সংগ্রাম পরিষদের শীর্ষ নেতারা বিভিন্ন জেলা সফর করে ছাত্র-জনতাকে দাবি আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেন। ১১ই মার্চ সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্র-যুবক গ্রেফতার হন। আন্দোলন তীব্র হয়। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ততদিনে বাঙালি ছাত্র-যুব সমাজের প্রধান স্লোগানে পরিণত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু, সামসুল হকসহ কয়েকজন নেতা ১৫ই মার্চ জেল থেকে মুক্তি পান। আন্দোলনের তীব্রতায় তদুপরি পাকিস্তানের স্থপতি ও গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ'র পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ব বাংলা) সফর চূড়ান্ত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ ভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সাথে বৈঠক করে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৬ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় জনসভা হয়। সভা শেষে শোভাযাত্রাসহ আইন পরিষদের কাছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পেশ করা হয়। ২১শে মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ঢাকায় আসে। রেসকোর্স মাঠে এক জনসভায় বলেন, উর্দুই কেবলমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। এর তিনদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও একই ঘোষণা দিলেন। ছাত্ররা তার সামনেই এর তীব্র প্রতিবাদ করে। তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

ছাত্র-জনতা একের পর এক প্রতিবাদ সভা করে বাঙালির সুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করে। আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান ১১ই সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। এ সময় পাকিস্তানি শাসকরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরসহ বিভিন্ন জেলা থেকে শত শত ছাত্র-যুবককে গ্রেফতার করে। ১৯৪৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু, সামসুল হক, মহিউদ্দিন আহমেদসহ অনেক ছাত্র-যুব নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে তারা মুক্তি পেয়েছেন।

১৯৫২ সালের শুরু থেকে ভাষা আন্দোলন নতুন মোড় নেয়। এসময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান উভয়ই পরলোকগত। লিয়াকত আলী খানের স্থলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দীন। তিনি ১৯৫২ সালের ২৫শে জানুয়ারি করাচি থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি ২৭শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে এক জনসভায় জিন্নাহ'র কথারই পুনরুক্তি করে বলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২৯শে জানুয়ারি প্রতিবাদ সভা এবং ৩০শে জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। সেদিন ছাত্রসহ নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সমবেত হয়ে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সভা এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারি সারাদেশে সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দেয়।

উল্লেখ্য, মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম ভাষাসৈনিক অলি আহাদ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের লিখিত বক্তব্য ও স্বাক্ষ্য এবং বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্ব থেকে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা ও ভূমিকার তথ্য জানা যায়। ১৯৪৯ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন এবং মুক্ত হন ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি। তিনি জেলেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ও রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে ১৭ দিন

ধরে অনশন করেছিলেন। তিনি কৌশলে জেল থেকেই আন্দোলনকারীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতেই ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। পরদিন ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভেঙেই মিছিল করে। ধর্মঘট সফল করে। আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী মিছিলের ওপর গুলি চালায়। সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারের লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে পড়ে থাকে। বহু ছাত্রছাত্রী আহত হয়। হাসপাতালে আহতদের ভিড়। এ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ২২শে ফেব্রুয়ারিও ছাত্র-যুব-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন-বিক্ষোভ করে। সফিউরসহ কয়েকজন মারা যায়। আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরু থেকেই বাঙালি শিক্ষিত নারীরা ভাষা আন্দোলনে যোগ দেয়। মুসলিম লীগ সরকারের ভিত কাঁপিয়ে তোলে। রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের কাছে নতিস্বীকার করে পাকিস্তানি সরকার। সরকার বাঙালির দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। এভাবেই একুশে ফেব্রুয়ারি সৃষ্টি হয়। বাঙালি জাতি মাতৃভাষার অধিকার ফিরে পায়। বাঙালি জাতি তার অন্যান্য অধিকার রক্ষার আন্দোলনের প্রেরণা পায়। বাঙালি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সেদিন প্রতিবাদী, সাহসী ও সংগ্রামী হয়ে উঠেছিল। বুকের রক্ত দিয়ে তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেদের মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির নবজাগরণের দিন। জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার দিন। বীরের জাতি হিসেবে বিশ্বে সমাদৃত হওয়ার দিন। আমাদের একুশ আজ বিশ্বের। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করছে। এ স্বীকৃতিরও রয়েছে ইতিহাস। ১৯৯৮ সালে কানাডা প্রবাসী কয়েকজন বাঙালি ও অন্যান্য ভাষাভাষীর একটি দল জাতিসংঘের তদানীন্তন মহাসচিব কফি আনানের কাছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রস্তাব দেয়। বাংলাদেশের সরকারও জাতিসংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সরকার এ লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে ইউনেস্কোর অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব পেশ করে। এরই ভিত্তিতে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা দেয়। এর মধ্য দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ছয় হাজারেরও বেশি ভাষার অধিকার রক্ষার দিনে পরিণত হয়েছে। সকল মাতৃভাষাভাষী সক্রিয় হয়েছে। তাদের স্বকীয়তা রক্ষায় তৎপর হয়েছে। এর ফলে বিশ্বের বিপন্ন ভাষাগুলো আবার প্রাণ ফিরে পাবে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা সংরক্ষণ, বিকাশ ও চর্চার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিভিন্ন ভাষা সজীব করার মাধ্যমে এমন এক বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব হবে, যেখানে সকল জাতি ও সকল ভাষা সমান অধিকার ও মর্যাদা পাবে। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভাষা আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলো আমাদের প্রেরণা। বাঙালি জাতির এ প্রাণশক্তি স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির বিজয়ই নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ১৯৯৬-এ জনগণের ভোটাধিকার রক্ষার আন্দোলন এবং ঢাকার শাহবাগে ১৭ দিন ধরে যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধী-রাজাকারদের সর্বোচ্চ সাজা প্রদান, জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধসহ ছয়টি দাবি নিয়ে অহর্নিশি আন্দোলনের প্রেরণা। তাদের এ চেতনা ও দাবির সাথে সব বয়সি ও পেশার মানুষ একাত্মতা প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে সরকারও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল আইন সংশোধন করে তরুণ প্রজন্মের দাবি আদায়ের পথ উন্মুক্ত করেছে। এই তারুণ্যের শক্তির কাছে যুগে যুগে অপশক্তি পরাজিত হয়েছে। বাঙালি তরুণ প্রজন্মের এই নবজাগরণ যত দীর্ঘস্থায়ী হবে দেশ তত দ্রুত আর্থসামাজিকভাবে এগিয়ে যাবে। জঙ্গিবাদ, ধর্মান্ধতা ও সব ধরনের অনাচার নির্মূল সহজ হবে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

মাতৃভাষা

তনয় সালেহা

মায়ের কথা মনে পড়লে যে মুখটি ভেসে ওঠে, পৃথিবীতে এমন মুখ আর নেই। এত আপন এত মায়াময়। সেই মুখের ভাষার কথাও যখন ভাবি তখনো তাঁর স্মৃতি জাগে মনের গহীনে। সেই ভাষা মায়ের ভাষা। মাতৃভাষা। প্রাণের ভাষা।

পৃথিবীর সকল মানুষ স্বপ্ন দেখে তার মাতৃভাষায়। মা তাঁর মুখের ভাষা দিয়ে একটি সন্তানকে মানুষ করে। গড়ে তোলেন ভবিষ্যতের উপযোগী করে। একটি সন্তান প্রথমে শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করে মায়ের কাছে এবং তা মাতৃভাষায়ই। এ কারণে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সীমাহীন।

মা যেমন সবচেয়ে আপন। মাতৃভাষাও সবচেয়ে প্রিয়। মাতৃভাষার মতো মধুর ভাষা পৃথিবীতে নেই। অন্য ভাষা কেউ শিখতে হলেও তাকে মাতৃভাষার সাহায্য নিতে হয়। মাতৃভাষাকে মাধ্যম করেই শিখতে হয়। যে কারণে মাতৃভাষা পৃথিবীর সব জাতির কাছে, মানুষের কাছে প্রিয়।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা ভাষা আমাদের কাছে অন্য সব ভাষা থেকে শ্রেষ্ঠ। এ ভাষাতেই আমরা প্রথম কথা বলি। এ ভাষাতেই স্বপ্ন বুনি।

বাঙালি বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষায় লড়াই করেছিল। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল। বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। এ সংগ্রামে যারা যোগ দিয়েছিলেন তারা আমাদের গৌরব। আমাদের সম্মানের প্রতীক। আমাদের ইতিহাস। আমাদের ঐতিহ্য চেতনার বাতিঘর। আমরা তাদের স্মরণ করি। তাদের শ্রদ্ধা করি। তাদের জানাই অভিবাদন। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় তারা আমাদের শিখিয়েছেন। তারা দেখিয়েছেন কীভাবে রক্ত দিতে হয়। রক্ত ও জীবনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের মাতৃভাষার সম্মান। আমার মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা আর দ্বিতীয়টি নেই। যে ঘটনা ঘটেছে বাংলার ইতিহাসে। ভাষার জন্য শহিদ হতে হয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষদের। এ কারণে বাংলা ভাষা আমাদের গৌরবের ভাষা।

ঠিক এ কারণেই বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা লাভ করেছে। বিশ্ববাসী জানে বাংলা ভাষার নাম। জানে বাংলা ভাষার সংগ্রামের কাহিনি। যে জাতি ভাষার জন্য প্রাণ দিতে পারে, সে জাতিকে দমিয়ে রাখা যায় না। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। মাত্র নয় মাসে একটি দেশ, একটি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছে– এমন ইতিহাসও পৃথিবীতে আর নেই। বাঙালি বীরের জাতি। ভাষা আন্দোলন বাহিত মুক্তি চেতনাই বাঙালিকে এনে দিয়েছে স্বাধীনতা। স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষা এগিয়ে যাবেই। সমৃদ্ধ হবেই এ ভাষা। সব বাধা তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবে মাতৃভাষার তরী।

লেখক: প্রাবন্ধিক

বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্ন ও যতিচিহ্নের ব্যবহার ইতিহাসের প্রেক্ষাপট

ড. মোহাম্মদ হাননান

'বিরাম' অর্থ বিরতি, বিশ্রাম অথবা অবসর। 'যতি' অর্থ ছেদ। কোনো কিছু একটানা লেখাও যায় না, পড়াও যায় না। কোনো কিছু লেখা বা পড়ার সময় শ্বাস নেওয়ার জন্য থামতেই হয়। কোনো লেখা পাঠ করার সময় কোথায়, কতক্ষণ থামতে হবে তার নির্দেশক যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তা-ই বিরামচিহ্ন বা যতিচিহ্ন। [*বাংলা একাডেমি সহজ বাংলা অভিধান*, মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ২৭৯, ৩৪০]।

এ বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট অভিমত আছে। কলকাতার আনন্দবাজার ভাষা কুশলীরা বলেন, বিরামচিহ্ন শব্দটির অর্থ থেকে যা বোঝা যায় তা হলো যতি বা ছেদের চিহ্ন। বাক্যে কোথায় স্বল্প বা পূর্ণ বিরতি, বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের বা পদের সুর (অর্থাৎ প্রশ্ন, বিস্ময়, নির্দেশ) ইত্যাদি বোঝাতে যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সাধারণভাবে তাকেই বিরামচিহ্ন বলা হয়। [*তিষ্ঠ ক্ষণকাল*, বাংলা বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, সুভাষ ভট্টাচার্যের ভূমিকা সংবলিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ১০]।

কোনো কোনো গবেষক অবশ্য প্রশ্নচিহ্ন ও বিস্ময়চিহ্নকে সরাসরি বিরামচিহ্নের 'অন্তর্ভুক্ত' করতে রাজি নন। তাঁরা এ দুটি চিহ্নকে বিরাম বা যতি বা ছেদচিহ্নের 'অন্তর্গত' বলে মনে করেন। 'লিখিত বাক্যে ছেদ বা বিরাম বোঝানোর জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাদের সাধারণ নাম ছেদচিহ্ন ও বিরামচিহ্ন। এছাড়া প্রশ্নসূচক কিংবা বিস্ময়সূচক বাক্যে যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাও ছেদচিহ্নের অন্তর্গত'। [অশোক মুখোপাধ্যায়: *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৯৬]।

বিরামচিহ্নের কাজ কী: বিরামচিহ্ন ছাড়া কোনো লেখা পাঠ করা অসম্ভব। এক শ্বাসে কোনো লেখা পাঠ করতে গেলে মানুষ অসুস্থ হয়ে যাবে, মৃত্যুও ঘটতে পারে, লেখাটির অর্থও বোধগম্য হবে না। তাই বিরামচিহ্নের একটি প্রধান কাজ হলো কোনো লেখা পাঠ করার সময় ১. শ্বাস বিরতির জায়গাটা দেখিয়ে দেওয়া ২. কোথায়, কতক্ষণ থামতে হবে তা নির্দেশ করা ৩. শ্বাস বিরতির শৈলী বা ভঙ্গিমা প্রকাশ করা (যেমন, যেখানে 'দাঁড়ি' সেখানে স্বাভাবিক বিরতি হয়ে থাকে, আবার যেখানে 'বিস্ময়চিহ্ন' সেখানে 'আশ্চর্যসূচক' কণ্ঠ-ভঙ্গিমায় বাক্য শেষ করতে হয়)।

বিরামচিহ্ন বাক্যে থাকার কারণেই কোনো লেখার মূল বক্তব্য পাঠকের কাছে সহজ হয়ে ওঠে। বলা চলে, লেখক যেভাবে কথাটি বলতে চেয়েছিলেন পাঠক সেভাবেই লেখাটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তাই বিরামচিহ্ন বাক্যের অর্থ বোঝার জন্য এক সহায়ক শক্তি।

বিরামচিহ্ন ব্যবহারের ইতিহাস: ঠিক কবে থেকে বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্ন বা যতিচিহ্ন ব্যবহার শুরু হয়েছে তা দিন-ক্ষণ গুণেই বলা যায়। আজ থেকে অন্তত এক হাজার বছর পূর্ব থেকেই বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্ন ব্যবহার শুরু হয়েছিল। আমাদের ভাষার প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদ-এ বিরামচিহ্নের প্রথম ব্যবহার আমরা দেখি:

১. কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল ॥
[চর্যাপদ: ২১ নং পদ]।

২. টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥
[চর্যাপদ: ৩৩ নং পদ]।

প্রাচীন আমলে বাংলা ভাষায় মাত্র দুটি বিরামচিহ্নই ছিল। একটি এক দাঁড়ি (।), আরেকটি দুই দাঁড়ি (॥)। এক দাঁড়িটি বর্তমান জামানার কমা (,)-এর কাজ করত, আর দুই দাঁড়িটি বর্তমান জামানার দাঁড়ি (।) বলতে যা বুঝি সেই কাজটিই করত।

প্রাচীন যুগের পর মধ্যযুগে এসে বিরামচিহ্ন ব্যবহারে এর বেশি অগ্রগতি নেই। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য অথবা শাহ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ জোলেখা* কাব্যেও আমরা মাত্র দুটি বিরামচিহ্নই দেখতে পাই:

১. জাহাত লাগিআঁ নিজ পতি না চাহীল।
লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল ॥
[*বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*: মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৭১]।

২. তিরতিএ পরণাম করোঁ রাজ্যক ঈশ্বর।
বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর ॥
রাজ রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নৃপ জগত বিদিত ॥
[শাহ মুহম্মদ সগীর: *ইউসুফ জোলেখা*, ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ ২০১৩, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১১৫]।

এখানেও চর্যাপদ-এর মতো 'কমা' হিসেবে এক দাঁড়ি এবং 'দাঁড়ি'

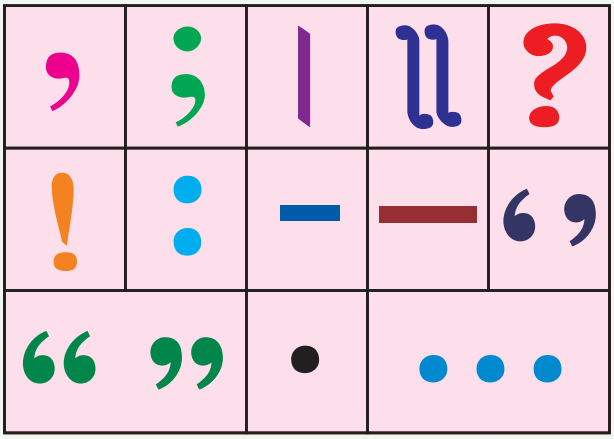

হিসেবে দুই দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। মধ্যযুগ পার হওয়ার আগেই আমরা কোনো কোনো কাব্যে 'দুই দাঁড়ি' ব্যবহার প্রবণতা কমে আসতে দেখি :

তিন গোটা তির ছিল একখানি বাঁশ
হাটে হাটে ফুল্লরা পসারা দিত মাঁস।
[*চণ্ডীমঙ্গল কাব্য*, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য আকাদেমি, নয়াদিল্লি, ১৩৮২, পৃষ্ঠা ৮৩]।

এখানে একটি মাত্র বিরামচিহ্নই ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা এক দাঁড়ি। তবে উপরিউক্ত কাব্যের কবি মুকুন্দরামের সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের রচনায় পূর্বের মতোই এক দাঁড়ি এবং দুই দাঁড়ি ব্যবহার অব্যাহত ছিল। অর্থাৎ চণ্ডীমঙ্গলের বাইরে ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যেও মাত্র দুটি বিরামচিহ্ন দেখতে পাই। মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ন ছিল।

ব্যতিক্রম ছিল শুধু পুথি সাহিত্য। পুথি সাহিত্যে বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে (১) এবং (২) চিহ্ন দ্বারা। (১) ব্যবহৃত হয়েছে কমা হিসেবে, আর (২) ব্যবহৃত হয়েছে দাঁড়ি হিসেবে। যেমন,

আর লাখে লাখে সৈন্য মরে কাতারে কাতার (১)
শুমার করিয়া দেখে চল্লিশ হাজার (২)
[*জঙ্গনামা পুথি*। স্মৃতি থেকে উল্লিখিত]।

বাংলা ভাষায় প্রথম 'কমা' (,) ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় বাউল কবিদের কবিতায়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যেসব বাউল গান সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন তাতে 'কমা'র ব্যবহার নানাভাবেই দেখা যায়। রাঢ় অঞ্চলের এক বাউলের গানে প্রতিটি চরণেই 'কমা'র ব্যবহারটি গুরুত্বপূর্ণ:

যার হৃদয়ে নাই ভাব-নিধি,
খেঁটে মরে বেদ-বিধি
তার হয় না মন শুদ্ধি,
মিছে তর্ক করে ব'কে মরে রে
যেমন স্থূল তুষে অবঘাত হয় ॥

[উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, নতুন সংস্করণ, ১৩৮৮, পদ নং ৫৯০]।

এখানে কমা'র সঙ্গে 'ঊর্ধ্বকমা'ও ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'দাঁড়ি'র জায়গায় দেওয়া হয়েছে 'দুই দাঁড়ি'। কোথাও 'এক দাঁড়ি' নেই। এই প্রথম আমরা বাংলা ভাষায় 'কমা' এবং 'ঊর্ধ্বকমা'র ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি।

তাহলে বাংলা ভাষায় আমরা বিরামচিহ্ন বা যতিচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি চর্যাপদ-এর আমল থেকেই, অর্থাৎ প্রাচীন আমল থেকেই বাংলা ভাষায় সীমিত আকারে বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণের যাঁরা পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ তাঁরা কিন্তু মনে করেন বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে ইংরেজ আমল থেকে। সুভাষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'প্রাচীন বাংলা গদ্যে বিরামচিহ্নের তেমন ব্যবহার হত না'। [সুভাষ ভট্টাচার্য, *বাংলা প্রয়োগ অভিধান*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ২৫]। তিনি অবশ্য বাংলা গদ্যে বিরামচিহ্ন ব্যবহার প্রসঙ্গেই কথাটি বলেছেন। বাংলা কবিতায় বিরামচিহ্ন, বিশেষ করে চর্যাপদ-এ বিরামচিহ্ন ব্যবহারের বিষয়টি তাঁর সামনে হয়ত ছিল না।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অবশ্য পুথি সাহিত্যের কবিতার কথা মনে রেখেছেন। বলেছেন, 'প্রাচীন বাঙ্গালা পুথিতে কেবল এক দাঁড়ি (১) ও দুই দাঁড়ি (২) ব্যবহৃত হইত, অন্য কোনো ছেদের প্রয়োগ ছিল না'। [সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: *সংক্ষিপ্ত ভাষা- প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, নবম সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৭০, পৃষ্ঠা ৫০]।

কিন্তু এখানে সুনীতিকুমারও চর্যাপদ বা এর পরবর্তী মধ্যযুগের কাব্যসমূহে এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি বিশিষ্ট ছেদচিহ্নের কথা উল্লেখ করেননি। গবেষকরা বেশিরভাগই মনে করেছেন, বিরামচিহ্ন ব্যবহারের বিষয়টি ইংরেজ আমল থেকেই শুরু। বাংলা ভাষা ও অভিধান বিষয়ক গবেষক সুভাষ ভট্টাচার্য বিরামচিহ্ন ব্যবহারের ইতিহাস আলোচনা করে লিখেছেন, '... ক্রমশ বিভিন্ন ছেদচিহ্নের প্রয়োগ শুরু হয়ে যায় এবং উনিশ শতকের বাংলা গদ্যগ্রন্থে কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি প্রভৃতি চিহ্নের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়'। তিনি অবশ্য একই সঙ্গে মন্তব্য করেন যে, 'উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত উদ্ধৃতি চিহ্নের তেমন ব্যবহার দেখা যায় না'। [সুভাষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫২]।

তবে এতকাল বাংলা বিরামচিহ্ন ব্যাপকভাবে প্রবর্তনে বিদ্যাসাগরের যে কৃতিত্ব ঘোষিত হতো তা গবেষকরা খণ্ডন করেন। সুভাষ ভট্টাচার্য এ ব্যাপারে রামমোহন রায়কেই স্বীকৃতি দিতে চান। তিনি মন্তব্য করেছেন,

> উনিশ শতকে বিরামচিহ্নের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যাপক ব্যবহারের একটি প্রধান কারণ রামমোহনের চেষ্টায় ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত বিরামচিহ্নের বাংলায় প্রচলন। রামমোহনই প্রথম বাংলা গদ্যলেখক যিনি প্রাচীন বিরামচিহ্নগুলি যথেষ্ট নয় বুঝে ইংরেজি বিরামচিহ্নের বাংলায় ব্যবহারের সাহস দেখিয়েছেন। [সুভাষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৩]।

রামমোহনের এই অবদান বিষয়ে ভিন্নমতও রয়েছে। কোনো কোনো গবেষণা এ ব্যাপারে রামরাম বসুকেই কৃতিত্ব দিতে চেয়েছে:

> রামরাম বসুই প্রথম সচেতনভাবে এবং অর্থপূর্ণভাবে বিরামচিহ্নের ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর ... (রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র) গ্রন্থের প্রথম দিকে প্রতিটি অনুচ্ছেদের শেষে একটি করে দাঁড়ি দেখতে পাচ্ছি। একাদশ অনুচ্ছেদে গিয়ে শেষ দুটি বাক্যে দাঁড়ি দেন তিনি। দ্বাদশ অনুচ্ছেদে প্রতিটি বাক্যের শেষেই একটি করে দাঁড়ি দিয়েছেন। গ্রন্থের শেষের কয়েকটি অনুচ্ছেদে প্রায় প্রতিটি বাক্যের শেষে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে রামরাম বসু বিরামচিহ্নের প্রয়োজন যতটা অনুভব করেছিলেন, সাহস করে ততটা ব্যবহার করতে পারেননি। তথাপি শুরুটা তিনিই করেছেন। [তিষ্ঠ ক্ষণকাল: বাংলা বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭]।

কিন্তু উনিশ শতকে যখন রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) তাঁর গ্রন্থ *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* (১৮০১ সালের জুলাই মাসে মুদ্রিত) রচনা করেন, তখন তো তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ও পুথি সাহিত্য থেকে দুটি বিরামচিহ্ন পেয়েই গিয়েছিলেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি বিরামচিহ্ন বাংলা ভাষায় ব্যবহারের আবিষ্কারটি তাঁর নয়, সূত্রপাতও তিনি করেননি।

আমরা যদি ইংরেজ উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) রচিত *কথোপকথন* গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহারের বিষয়টি পর্যালোচনা করি যা প্রায় একই বছর কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দেখব, গ্রন্থটিতে শুধু ইংরেজি বাক্যের বিরামচিহ্নের মতো বাক্যের শেষে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য কোনো চিহ্ন নয়। শুধু কেরী নয়, অন্যান্য খ্রিষ্টান মিশনারিরাও যেসব মৌলিক বাংলা পুস্তক লেখার চেষ্টা করেছিলেন সেখানেও শুধু 'এক দাঁড়ি' বিশিষ্ট একটি বিরামচিহ্নই ব্যবহৃত হয়েছে।

অনেকে মনে করছেন, বাংলা ভাষার এত কিছু সংস্কৃত ভাষা থেকে আসল, তাহলে এক দাঁড়ি- দুই দাঁড়িও নিশ্চয়ই সংস্কৃত থেকেই এসেছে, 'এই এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে'। [*তিষ্ঠ ক্ষণকাল*, আনন্দ পাবলিশার্স, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৭]। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এক দাঁড়ি-দুই দাঁড়ি আমরা হাজার বছরের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি চর্যাপদ-এও পাচ্ছি। চর্যাপদ একান্তভাবেই প্রাকৃতজনের ভাষা, তা মাগধী প্রাকৃত বা গৌড়ী প্রাকৃত, যেটাই হোক না কেন। এখানে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব আসার তাই প্রশ্নই আসে না। বিরামচিহ্ন দুটি বাংলা ভাষারই নিজস্ব ছিল।

কারণ রামরাম বসু কিংবা রামমোহন রায় যাকেই আমরা বাংলা গদ্য-ভাষায় বিরামচিহ্ন প্রবর্তনের কৃতিত্ব দেই না কেন, তা তো 'এক দাঁড়ি' বা 'দুই দাঁড়ি' ছাড়া অন্য কিছুই নয়। অথচ এই দুটি বিরামচিহ্ন বাংলা ভাষায়, বিশেষ করে কবিতায় প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ১৮১৯ সালের আগ পর্যন্ত তাঁরা কেউই এই দুই চিহ্ন ছাড়া অন্য কোনো চিহ্ন তাঁদের পুস্তকে ব্যবহার করেননি। ১৮১৯ সালে রামমোহন রায়ের *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ* নামক পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং এই প্রথম আমরা এক

দাঁড়ির পাশাপাশি আরো দুটো চিহ্ন : ১. প্রশ্নচিহ্ন (?), ২. অর্ধচ্ছেদ বা সেমিকোলন (;) দেখতে পাই। মাঝে মাঝে পুস্তকটিতে দুই দাঁড়িও ব্যবহৃত হয়েছে।

এর মধ্যে বাংলা গদ্যের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)-এর *নববাবু বিলাস* (১৮২৩), হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স (১৮২৬-১৮৬১)-এর *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* (১৮৫২), প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)-এর *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮), কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩-১৯৮৬)-এর *বিজয় বসন্ত*, কালী প্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)-এর *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬২) ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে। এ সকল গ্রন্থে নানারকম বিরামচিহ্নের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। যেমন,

১. ফলের কিঞ্চিৎ বর্ণন করি, বিচক্ষণ বাস্তবিক বাবু মহাশয়েরা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করিবেন। ... পরে বাবুর সতী এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কিরূপ মনে মনে খেদ করিতেছেন তাহা শ্রবণ করুন ॥ [ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় : *নববাবু বিলাস*, প্রথম যুগের ছয় উপন্যাস, আরজুমন্দ আরা বানু সম্পাদিত, অনন্যা, ঢাকা, ২০১২, পৃষ্ঠা ৮০- থেকে উদ্ধৃত]।

১৮২৩ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থে মাত্র তিনটি বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। ১. কমা (,) ২. এক দাঁড়ি (।) ৩. দুই দাঁড়ি (॥)। দেখা যাচ্ছে, ইংরেজি ভাষার প্রভাবে কমা'র আগমন ঘটলেও দুই দাঁড়ি এখনই বিদায় নিচ্ছে না।

২. সে আমার মুখ পানে কিঞ্চিৎকাল অসভ্যরূপে তাকাইয়া ফুলমণির প্রতি ফিরিয়া ফুসফাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উনি কে? ফুলমণি বলিল, ইনি নূতন মেজিস্ট্রেট সাহেবের বিবি।

এই কথা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোক কিঞ্চিৎ ভয় পাইয়া আমাকে অতি নম্রতা পূর্ব্বক সেলাম করিল; পরে সে ফুলমণিকে ধীরে ২ বলিতে লাগিল, ফুলমণি, তোমার কপাল বড় ভাল।

❑ হে মাতাগণ! ফুলমণি যেরূপ আপন সন্তানদিগকে সুশিক্ষা দিয়া তাহাদের নিমিত্তে নিত্য ২ প্রার্থনা করিত, ... তেমনি তোমরাও করিও।

❑ তিনি কহেন, "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল! তোমরা আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।"

[হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স: ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৯২, ১৯৪]।

১৮৫২ সালে প্রকাশিত এই *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* গ্রন্থে আমরা বিরামচিহ্ন ব্যবহারে বড়ো ধরনের অগ্রগতি পাই। ১. এক দাঁড়ি ২. প্রশ্নচিহ্ন ৩. কমা ৪. আশ্চর্যবোধক চিহ্ন ৫. উদ্ধৃতিচিহ্ন। তবে আশ্চর্যবোধক চিহ্নটি এ গ্রন্থে সম্বোধনসূচক ('হে মাতাগণ!') হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

৩. বেচারাম। বাবুরামবাবু! তুমি কাহার বুদ্ধিতে এ সম্বন্ধ করিয়াছ? টাকার লোভেই গেলে যে! তোমাকে কি বলব? এ আমাদের জেতের দোষ।

❑ মতিলালের নিকট যে ব্যক্তি আইসে সেই হাই তুলিলে তুড়ি দেয় হাঁচিলে "জীব" বলে।

❑ ... মতিলালের নিকট লোক গস্ গস্ করিতে লাগিল ক্ষণ নাই মুহূর্ত. নিমেষ নাই সর্বদাই নানা প্রকার লোক আসিতেছে বসিতেছে যাইতেছে। [প্যারিচাঁদ মিত্র: *আলালের ঘরের দুলাল*, পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৩৮, ২৭৮]।

আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) গ্রন্থে পূর্বের গ্রন্থগুলোর মতোই ১. এক দাঁড়ি, ২. আশ্চর্যবোধক চিহ্ন ৩. প্রশ্নবোধক চিহ্ন ৪. কমা ৫. উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার দেখতে পাই। তবে এ গ্রন্থে বিরামচিহ্নের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ড্যাশ (–) ব্যবহার করতে দেখি এবং ড্যাশ কারণে-অকারণে বহুলভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। আশ্চর্যবোধক চিহ্নটি পূর্বের গ্রন্থের মতোই সম্বোধন সূচক রয়েছে।

হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) সাংবাদিক ছিলেন। সমকালে অন্যান্যর তুলনায় তাঁর গদ্যে বিরামচিহ্নের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সুললিত ও বিশৃঙ্খলমুক্ত হয়ে প্রকাশিত হতে দেখি। তাঁর গদ্যে প্রথমবারের মতো পদসংযোগ চিহ্ন (হাইফেন) ব্যবহৃত হয়েছে :

৪. একদিন প্রভাকরের প্রখর-কর-প্রভাবে উদ্যানস্থল অতিশয় উত্তপ্ত...। [*বিজয় বসন্ত*, পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩১৯]।

এ গ্রন্থে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন সম্বোধনসূচক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও কোথাও কোথাও বিস্ময়সূচক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সম্বোধনসূচক,

❑ হা বৎস! কি করিলে,...

❑ মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ! শ্রবণ কর;

[*বিজয় বসন্ত*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩১৮, ৩১৯]।

কিন্তু অন্যত্র, বিস্ময়সূচক হিসেবেও এ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে:

❑ স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? ছি! ছি! লোকে ইহা জানিতে পারিলে, কি না কলঙ্ক সম্ভাবনা? [*বিজয় বসন্ত*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬৬]।

হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় কালী প্রসন্ন সিংহ অন্যান্যর মতোই বিরামচিহ্নগুলো ব্যবহার করেছেন, তবে তিনি যখন বিস্ময়সূচক চিহ্নটি ব্যবহার করেছেন, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তিনবার করে তাকে প্রয়োগ করার প্রবণতাও লক্ষণীয় :

❑ আমরা তাঁদের অনুরোধ করি, নারকেল মুড়ি ও ঠন্ঠনের নিমকীটাও ট্রাই করুন! ইমিজিয়েট রিলিফ!!!

❑ কেবল শামচাঁদীরা সল্লে!!!

এই *হুতোম প্যাঁচার নকশা*'য় আরো একটি নতুন চিহ্ন প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে, তাহলো, হসন্ত (্) চিহ্ন :

❑ অবশেষে গ্রান্টের রিজাইনমেন্টে রোগ সার্‌তে পারেন?

❑ তার দরুণ নীলকর দল হন্নে হয়ে উঠ্‌লেন।

[*হুতোম প্যাঁচার নকশা*, পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৪৪৯, ৪৫০]।

গবেষকরা মনে করেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিরামচিহ্নের প্রয়োগে বড়ো রকমের পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছিলেন'। [সুভাষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৫৩]। কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ *বেতাল পঞ্চবিংশতি* যা ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে মাত্র একটি বিরামচিহ্ন 'এক দাঁড়ি' (।) ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৮৬৫ সালের আগ পর্যন্ত দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ব্যবহারে তাঁকে স্বচ্ছন্দ দেখি না। এই সময় (১৮৬৫ সনে) তাঁর *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার* পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলনসহ অন্যান্য বিরামচিহ্নের একটা যথাযথ ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। কিন্তু ততদিনে তো *নববাবু বিলাস* (১৮২৩), *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮), *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬২) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে, যেখানে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, বিস্ময়চিহ্ন, প্রশ্নবোধক চিহ্ন ইত্যাদির ব্যবহার এর আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বরং বিস্ময়চিহ্নকে সম্বোধনসূচক করে ব্যবহার করার প্রবণতা আমরা বিদ্যাসাগরের মধ্যেও পাই, যা অন্যান্য লেখকেরাও এর অপব্যবহার করেছেন:

শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইয়া বসুপ্রিয় বলিলেন, মহাশয়!

আপনি কেমন কথা বলিতেছেন;

অন্যত্র,

শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে নির্ব্বোধ! আমি হার না পাইয়া টাকা দিব কেন?

[ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা: *ভ্রান্তিবিলাস* (১৮৬৯), বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৯, পৃষ্ঠা ২৩৯]।

তবে 'বিস্ময়চিহ্ন' ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই 'অপব্যবহার' কথাটি হয়ত পুরোপুরি সঠিক সিদ্ধান্ত হয় না, বরং সে আমলে 'সম্বোধন' করার মধ্যে এক প্রকার বিস্ময়সূচকতা কাজ করতো, অনেকটা যাত্রা-পালায় আমরা এখনো এরকমটা লক্ষ করে থাকি। সেদিক থেকে উনিশ শতকের লেখকরা যে বিস্ময়সূচক চিহ্নটি বিস্ময় এবং সম্বোধন দুক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন, তা হয়ত আজকের যুগের মাপকাঠিতে অবমূল্যায়ন করা ঠিক হবে না।

বাংলা বিরামচিহ্ন অতঃপর শৃঙ্খলায় আসে এবং যৌক্তিক পরিণতি লাভ করে রবীন্দ্রনাথের হাতেই :

সময় নাই! শিবতোষ কাছে আসিয়া দেখিল, দামিনী অন্ধকার ঘরে বসিয়া গহনার বাক্স খুলিয়া গহনাগুলি বাহির করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, এ কী করিতেছ? দামিনী কহিল, আমি গহনা গুছাইতেছি।

এই জন্যই সময় নাই! বটে!

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চতুরঙ্গ, রবীন্দ্র সমগ্র, খণ্ড ৪, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১১, পৃষ্ঠা ৪৪১]।

দাঁড়ি, কমা, বিস্ময়চিহ্ন, প্রশ্নচিহ্ন ইত্যাদি যথাযথ ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় বিরামচিহ্নের একটি সুষ্ঠু রূপকে দাঁড় করিয়ে দেন।

আধুনিক বাংলায় বিরামচিহ্নের ব্যবহার

আধুনিক বাংলা ভাষা বলতে এই একুশ শতকে বিরামচিহ্ন ব্যবহার বিধিটি পূর্ব ঐতিহ্যের অনেক কিছুই ধরে আছে। তবে প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং বানান সংস্কারের নানা নীতিমালায় পড়ে বিরামচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে। ঊর্ধ্বকমা ব্যবহারের একটা রেওয়াজ পূর্ব থেকেই ছিল, বিশ শতকের শেষে এর খুব অপব্যবহারও হচ্ছিল। বানান সংস্কারকরা মনে করছেন, ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার এখন প্রয়োজন নেই।

সেমিকোলন ব্যবহার এখন খুব বেশিই কমে গেছে, গেটআপ-মেকআপে বিসদৃশ লাগে বলেই নয় শুধু, এর ব্যবহার বিধিটাও লেখক-পাঠক, ছাত্র-শিক্ষকের কাছে অনেকটা অজানা বলেও অথবা প্রয়োজনও অনুভূত হয় না।।

'হাইফেন' (-), 'ড্যাশ' (–)-এর তাৎপর্য যেন একাকার হয়ে গেছে। 'ড্যাশ'-এর জায়গায় অকাতরে 'হাইফেন' ব্যবহার হচ্ছে, অথচ দুজনের অর্থগত কোনো মিলই নেই।

উদ্ধৃতি চিহ্নে ("/") দুটো করে কমা না দিয়ে একটি করে ('/') কমা দিয়ে যাচ্ছেন লেখকরা, হয়ত একটি করে পালটাপালটি দিলে মূল অর্থটা প্রকাশ পেতে সমস্যা হয় না বলেই এটা চালু হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ, স্তবক বিভাজন গদ্য-পদ্যে কমে যাচ্ছে বলেই মনে হয়। কবিরাও বিশাল বিশাল স্তবকে কবিতা শেষ করছেন, গদ্য লেখক এমনও আছেন যে, দু'এক পৃষ্ঠা পরেও একটা অনুচ্ছেদ দিতে কার্পণ্য করছেন। এটি হয়ত একুশ শতকের একটি শৈলী হয়ে দাঁড়াতে পারে। এতে ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে– সে তো কাল বিচার করবে, তবে শ্বাসকষ্টে থাকা পাঠকের বড়ি খাওয়ার মাত্রা এতে বাড়বে বৈ কমবে না।

লেখক: গ্রন্থকার ও গবেষক

কর্মমুখী শিক্ষা ছাড়া সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়

ফারিহা হোসেন

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত হয়েছে প্রযুক্তি। কাগুজে বইয়ের সাথে প্রযুক্তি যুক্ত হয়ে সমগ্র বিশ্বে শিক্ষায় অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। একই সাথে কর্মমুখী তথা প্রযুক্তি নির্ভর অর্থাৎ কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বিশ্বের দেশে দেশে। একটি দেশকে সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে আবশ্যক প্রযুক্তি নির্ভর কারিগরি শিক্ষা।

আশার কথা হচ্ছে, বর্তমানে শেখ হাসিনার সরকার প্রযুক্তি এবং কারিগরি শিক্ষায় নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। মানসম্পন্ন আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষাই পারে যোগ্য ও দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরি করতে। আর এজন্যই শিক্ষার মানোন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

স্বাধীনতার ৪৮ বছরে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ, বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে, অবকাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে এবং শিক্ষকদের সংখ্যা বেড়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পরীক্ষা গ্রহণে নানা পরিবর্তন হচ্ছে। তবে বাস্তবায়ন করা জরুরি কারিগরি– প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা। একই সঙ্গে শিক্ষায় ব্যয় হ্রাস, মান বৃদ্ধি আবশ্যক। কারণ যুগের সাথে পাল্লা দিয়ে জ্ঞান অন্বেষণের সঙ্গে মানের হ্রাস-বৃদ্ধি যেহেতু জড়িত, তাই জ্ঞানের বিকাশ ও উৎকর্ষের সঙ্গে শিক্ষার মানেও পরিবর্তন আনা জরুরি। যুগোপযোগী শিক্ষার বিষয়টি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-শিল্পকলা-মানবিক-দর্শন বিষয়ের অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত। একটি দেশ কতটুকু উন্নত হবে অথবা তার ভবিষ্যৎ কোনদিকে ধাবিত হচ্ছে, তা নির্ভর করে সেই জাতির শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনার ওপর।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ শেখ হাসিনার বিশাল সাফল্য। এখন সংশ্লিষ্ট মহলের দায়িত্ব হলো এই নীতির বাস্তবায়ন করা। একজন শিক্ষকের সঠিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই সুশৃঙ্খল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে ঐ শ্রেণির কার্যক্রম। শিক্ষক তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, ব্যক্তিত্ব, মেধা-যোগ্যতা, মননশীলতা আর আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। একজন শিক্ষককে হতে হবে দৃঢ়চেতা, উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, নিরপেক্ষ, অকুতোভয়, সত্যবাদী। তিনি তার অনুপম চরিত্র মাধুর্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মন জয় করবেন। এক কথায় তিনি হবেন তার নিজস্ব স্বকীয়তায় অভিনেতা-শিক্ষক, শিক্ষার্থীর কাছে এক অনুস্মরণীয় আদর্শ।

পাঠ্যসূচির পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য পরিবারের সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। বরং পারিবারিক আবহাওয়ায় একজন শিশু যা শিখতে পারে না, তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শেখাতে পারে। বর্তমানে শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা অনেক বেড়েছে। শিক্ষকদেরও শ্রেণিকক্ষে আরো আন্তরিক হতে হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। তবে মেধার ভিত্তিতে যে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে, তার পরিমাণ আরো বৃদ্ধিসহ গরিব শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করতে পারলে শিক্ষাক্ষেত্রে আরো ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। একই সাথে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে কারিগরি শিক্ষা প্রসারে।

লেখক: কলাম লেখক ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক

মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলে

বাংলা সাহিত্যের প্রসার

সুফিয়া বেগম

মধ্যযুগের শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই বাংলা ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা রূপে সমৃদ্ধ হয়। মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত স্থপতি বলা চলে। কাজী দৌলত, আলাওল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে উচ্চমার্গে নিয়ে যান। প্রাচীন আমলে বাংলায় বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গ–বরেন্দ্র, ভাগিরথীর পশ্চিম তীর–রাঢ়। পূর্ব বাংলা–বঙ্গ এবং মেঘনা-পূর্ব এলাকা–সমতট নামে পরিচিত ছিল। মুসলমান শাসন আমলেই (চতুর্দশ শতকে) সারা বাংলা একত্রীভূত এবং একক শাসনাধীনে আসে এবং বাংলা 'বাঙালা' নামে পরিচিতি পায়। মোগল আমলে বাংলা 'সুবা বাংলা', ইংরেজ শাসনামলে বেঙ্গল, বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত।

বাংলার আদিরূপ চর্যাপদ থেকে চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এবং কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* পর্যন্ত আসতে কয়েকশ বছর লেগে যায়। বাংলা ভাষা মুসলমানদের ভাষা নয়, বাংলা সাহিত্য মুসলমানদের সাহিত্য নয়– এটি এক সময় তার্কিক বিষয় ছিল। বিতর্কের ঊর্ধ্বে পণ্ডিতরা একমত হন যে, ইলিয়াস শাহী আমলেই চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* রচিত হয় এবং মুসলিম শাসনামলেই বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়।

আরাকান রাজসভার কথা উল্লেখ করতে হয়। সেসময় আরাকান রাজ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় উৎসাহিত করতেন এবং কবিদের নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

এক সময় আরাকান ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে আরাকানবাসীরা বসবাস করে আসছিল বহু বছর ধরে। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে আরাকানবাসীদের 'রোয়াঙ্গ' নামে উল্লেখ করা হয়। আরাকানের ইতিহাস জানতে আমাদের সাহায্য করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য। মহাকবি আলাওল, কোরেশিমদন, মাগন ঠাকুর, নসরুল্লাহ খান প্রমুখ রোয়াঙ্গ রাজসভার কবি ছিলেন। আরাকান রাজসভায় উল্লিখিত কবিগণ বাংলা সাহিত্যের প্রসার ঘটান। আরাকানীদের অনেকেরই ভাষা ছিল বাংলা এবং তাদের সিংহভাগই ছিলেন মুসলমান।

সুনির্দিষ্টভাবে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনার পূর্বে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যচর্চা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা যাক। আগেই বলেছি, মধ্যযুগের মুসলিম শাসকরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি।

এক সময় ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন গৌড়েশ্বর। সেকালে বাংলা সাহিত্যে বাংলায় সুলতানদের গৌড়েশ্বর বলা হতো। রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। তাকেও গৌড়েশ্বর বলা হতো। ঐতিহাসিকদের মতে, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতেন এবং পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজকে বঙ্গে নিমন্ত্রণ করেন। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ বিদ্বান ও কাব্যামোদী হওয়ার ফলেই কৃত্তিবাসের সমাদর করা সম্ভব ছিল। তাই ঐতিহাসিকগণ সব বির্তকের ঊর্ধ্বে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহই কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনায় উৎসাহিত করেন। উল্লেখ্য, কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ কাব্যে একবারও গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেননি। কারণ হিসেবে ঐতিহাসিক ড. আবদুল করিম দুটি বিষয় উল্লেখ করেন। এক, রামায়ণের পাঠে গায়েন ও শ্রোতা উভয়েই পুণ্য লাভ করেন (ব্রাহ্মণদের বিশ্বাস), সেক্ষেত্রে যবন মুসলমানদের নাম উল্লেখ করা ন্যায়সংগত নয়। দুই, আজম শাহের রাজত্বকালেই হিন্দুরা ক্ষমতাবান হন এবং শাহকে হত্যা করে। উল্লেখ্য, আজম শাহের রাজত্বকালেই অনেক হিন্দু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কৃত্তিবাস ছিলেন হিসেবী। রাজনীতি সেসময় ওলটপালট হয়ে পড়ে।

কৃত্তিবাস তাই বুদ্ধি করে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের নাম উল্লেখ করতে সাহস পাননি। সুখময় মুখোপাধ্যায় সুষেন পণ্ডিতের সূত্র এবং বঙ্গদেশে প্রমোদের সূত্রের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহই কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বর।

ড. আবদুল করিমের মতে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচিত হয় গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের শাসনামলেই। ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩৮৬ খ্রি.। এ সময়েই গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ রাজ্য শাসন করেন। নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামের কৃত্তিবাস বাংলায় আদি কবি না হলেও তাঁর *রামায়ণ* বা *শ্রীরাম পাঁচালী* ছিল এক সময় বাংলার প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ। সুতরাং গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সময় *রামায়ণ* রচিত হয়, সেই হিসেবে বাংলা ভাষায় রচিত তৃতীয় এবং মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে রচিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিন-চারজন সুলতান, ষোড়শ শতাব্দীতেও তিন-চারজন সুলতান আর কয়েকজন মুসলমান শাসনকর্তা বাংলা ভাষায় বাঙালি কবিদের কাব্য ও কবিতা রচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন।

কায়স্থ মালাধর বসু রচিত বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরাণাশ্রিত আখ্যান কাব্য *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*। এটি বাংলা ভাষায় রচিত চতুর্থ গ্রন্থ এবং মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ। *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* বাংলায় কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রথম কাব্য। এটি ছিল অব্রাহ্মণদের রচনা। প্রতিদিন জ্ঞানচর্চা, শিক্ষাদান, সাহিত্যচর্চা ছিল ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার। অব্রাহ্মণদের জ্ঞানচর্চা ছিল নিষিদ্ধ। আর সাহিত্যচর্চা– সেতো অকল্পনীয়। সুতরাং *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* বাংলা সাহিত্যের জন্য বিপ্লব।

রাজশক্তির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয় মূলত শাহদের আমলে (১৪৯৮-১৫৩২ খ্রি.)। এই রাজশক্তি ছিল বাঙালি ভাবাপন্ন, তাদের সহানুভূতির ফলেই বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

শাহ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বিপ্রদাস রচনা করেন *মনসা বিজয়*। *মনসা বিজয়* বাংলা ভাষায় রচিত পঞ্চম ও মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত তৃতীয় গ্রন্থ। এ কাজে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য ও সম্প্রীতির কথা উল্লেখ আছে।

হোসেন শাহের এক কর্মচারী যশোরাজ খান তিনি রচনা করেন বাংলায় *কৃষ্ণলীলা কাব্য*। এটি বাংলা ভাষায় রচিত ষষ্ঠ ও মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত চতুর্থ কাব্য। পূর্ববঙ্গের নিম্নতটের অধিবাসী বিজয়গুপ্ত। তিনিও *মনসা মঙ্গল* নামে একটি কাব্য রচনা করেন কিন্তু এটি যে ১৪১৬ সালে রচিত হয়েছিল তা কোনো পুথি দ্বারা সমর্থিত নয়। তাই *মনসামঙ্গল*কে বাংলা ভাষার সপ্তম গ্রন্থ বলে দাবি করা যায় না। তবে মুসলমান পৃষ্ঠপোষকতায় এটি পঞ্চম গ্রন্থ। উল্লেখ্য হোসেন শাহ-এর আরো দুজন কর্মচারী গীতি-কবিতা লিখে যশ লাভ করেন। রূপ গোস্বামীর *উদ্ধব সন্দেশ* কাব্য এবং *সংস্কৃত পদাবলী* হোসেন শাহের শাসনামলেই রচিত হয়।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হচ্ছে স্বাধীন সুলতানি আমলের দু'শ বছর। সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তা ফকরুদ্দিন মুবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষণার (১৩৩৮ খ্রি.) মধ্য দিয়ে এই যুগের শুরু হয় আর শেরশাহ সুরের কাছে গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের পরাজয়ে (১৫৩৮ খ্রি.) এই যুগের শেষ হয়। ফলে বঙ্গে সুদীর্ঘ সময় ইলিয়াস শাহী বংশ (১৩৪২-১৪১৪ খ্রি.) শাসন করে। এরপর বিভিন্ন শাসক বঙ্গ শাসন করেন। তবে বঙ্গে স্বাধীন সুলতানি

আমলের সুদৃঢ়করণ এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসকদের গৌরব সর্বাধিক। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়া সমগ্র বঙ্গের ওপর পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

এই কারণে ঐতিহাসিক আফিফ ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙাল', 'শাহ-ই-বাঙালীয়ান' এবং 'সুলতান-ই-বাঙালা' রূপে অভিহিত করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই বঙ্গ বলতে শুধু পূর্ববঙ্গ নয়, মুসলিম শাসিত সমগ্র বঙ্গভূমি বোঝাতে থাকে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক হোসেন শাহী বংশের রাজত্বকালকে বাংলার ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' নামে চিহ্নিত করে থাকেন।

বস্তুত পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে চট্টগ্রাম বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। চট্টগ্রাম থেকে এই সংস্কৃতির ঢেউ অনতিবিলম্বে তথাকার রাজ সভাসদদের মারফত আরাকানে পৌঁছেছিল। প্রতিবেশী দেশ আরাকানের সাথে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে। তখন থেকেই চাটিগাঁ ও নিম্নবঙ্গের সংলগ্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষিত মুসলমানেরা আরাকানে গিয়ে রাজসভায় জাঁকিয়ে বসে।

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা পেতে থাকে। রোসাঙ্গ (আরাকান) রাজ আমাত্যেরা বেশিরভাগ ছিলেন সিলেট-চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুসলমান। এদের প্রভাবেই সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি উচ্চাসন লাভ করে। সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভায় মুসলমান প্রভাব এতই বৃদ্ধি পায় যে, আরাকান বৌদ্ধ রাজাদের অভিষেক বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পৌরোহিত্য না করে সেখানকার রাজসভার মুসলমান মন্ত্রীরা পৌরোহিত্য করতেন। আরাকান রাজ সান্দু-থু-ধম্মার অভিষেক অনুষ্ঠানে তদীয় মুসলমান প্রধানমন্ত্রী নবরাজ মুসলিম শপথ বাক্য পাঠ করান।

খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চর্যাগীতি রচনার পর বাংলা সাহিত্যচর্চা স্তব্ধ হয়ে যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে বড়ু চণ্ডীদাস *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* রচনার মধ্য দিয়ে এই স্তব্ধতা ভঙ্গ হয়। চণ্ডীদাসের এই গ্রন্থ খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম গ্রন্থ। পরমেশ্বর দাস *মহাভারতের* কাহিনি বাংলা ছন্দে বিবৃত করেন। এটিই বাংলা ভাষায় লেখা সর্বপ্রাচীন *মহাভারত* কাব্য। কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল।

হোসেন শাহী আমলের উত্তর চট্টগ্রামের শাসক লস্কর পরাগল খানের নাম বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। ড. দীনেশচন্দ্রের মতে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ১৭ হাজার শ্লোকে *মহাভারত* রচনা করেন। পণ্ডিত কৃত্তিবাস বাংলা *রামায়ণের* আদি কবি। তিনি প্রাক-চৈতন্য যুগের কবি। বাংলা *মহাভারতের* আদি রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রাক-চৈতন্য না হোক শ্রীচৈতন্যের সমকালীন কবি, হয়তবা বয়সেও অগ্রজ। বাংলায় এই *প্রথম মহাভারত* রচিত হয়।

'*চর্যাপদ*' শুরু হয়েছিল বৌদ্ধ যুগে। অনেক ঐতিহাসিক দাবি করেন, হিন্দু যুগে বাংলা সাহিত্যের প্রসার ঘটেনি বরং স্তব্ধ হয়ে যায়। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রবর্তনকালে লক্ষণীয় বিষয় ছিল, সেকালের ব্রাহ্মণদের কাছে সংস্কৃত ছিল 'দেব ভাষা'। সেকালে ব্রাহ্মণগণ বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন– যারা বাংলা ভাষায় অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ পড়বে তারা নরকে যাবে। বস্তুত নরকে যাবার ভয়ে হোক কিংবা রামায়ণ পাঠে ভীত হয়ে হোক, হিন্দু যুগে বাংলা সাহিত্য চর্চা হয়নি। আজকের বাংলা সাহিত্যের যে প্রসার, তার ভিত রচিত হয় মুসলিম শাসনামলেই। বাংলার জনগণের মুখের ভাষা বাংলা, এই ভাষা সাহিত্যের রূপ নিতে দীর্ঘ সময় লাগে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ অবদান হলো দেশি ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। আস্তে আস্তে মুসলমানেরা নিজেরা বাংলা কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। বাংলায় মুসলিম শাসকেরা রাষ্ট্রভাষা ফারসি প্রবর্তন করলেও দরবারে *মহাভারত*, *পুরাণ* পাঠে উৎসাহিত করতেন। দেশি জনগণের মুখের ভাষা বাংলা। সে ভাষা চর্চা ও বাংলা সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করতেন কবিদের।

বাংলা ভাষা চর্চা ও সাহিত্য রচনার পেছনে মুসলমান শাসকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য একেবারে অগ্রাহ্য করার বিষয় নয়। কথিত আছে, রাজা লক্ষ্মণ সেনকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি ১৭ জন অশ্বারোহী দিয়ে অতর্কিত আক্রমণ করে পরাজিত করেন, যদিও লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদ পূর্বেই বখতিয়ার খিলজি ঘেরাও করে রাখেন শত শত সৈন্য দ্বারা। লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়কে অনেক সহমর্মী, বিদগ্ধ পাঠক ও চিন্তাবিদ বাংলার পরাজয় মনে করে মর্মাহত হন। কিন্তু রাজ্যশাসন ভিন্ন বিষয়। উল্লেখ্য, লক্ষ্মণ সেনের রাজদরবারের ভাষা ছিল সংস্কৃত অথচ সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। তৎকালীন আমলে রাজা-প্রজার মধ্যে ভাষাগত পার্থক্যের কারণে যে ফারাক তৈরি হয়েছিল তার ফলেই লক্ষ্মণ সেনের পতনে জনগণের মধ্যে খুব একটা প্রতিক্রিয়া হয়নি। সাধারণ মানুষ ভেবেছে রাজা আসবে, যাবে। এই সুযোগ গ্রহণ করে মুসলিম শাসকগণ। সাধারণ জনগণের মুখের ভাষা বোঝার চেষ্টা করেন তারা। তারা বুঝতে পারেন সাধারণ জনগণের মুখের ভাষা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জেনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে তাদের শাসন দীর্ঘস্থায়ী করা যাবে না। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই রাজশক্তির সঙ্গে সাধারণ মানুষের মেলামেশা অবাধ ও সহজ করার জন্য মুসলিম শাসকরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা উৎসাহিত করতে শুরু করেন।

কালক্রমে হিন্দু বিদ্বান সাহিত্যানুরাগীরা বাংলা সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন। বাংলা সাহিত্যের বয়স হাজার বছরের বেশি নয়। বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে দেশি-বিদেশি শব্দ ভাণ্ডারে। সংস্কৃত থেকে সৃষ্ট বলেই সংস্কৃতকে বাংলা ভাষার জননী বলা হয়। প্রাথমিকভাবে সৃষ্ট বাংলা সাহিত্য ছিল স্বাভাবিকভাবে সংস্কৃতজ সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু হয় দশম শতাব্দীতে। সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদ*। বোধগম্য ভাষায় রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* যা ১৪৫০ থেকে ১৫২০ সালের মধ্যে অনুলিখিত। এ কাব্যের বুনিয়াদ যদিও সংস্কৃত। তা সত্ত্বেও এ কাব্যের ভাষা বোধগম্য বাংলা ভাষা। সে অর্থে কৃত্তিবাস ওঝার *রামায়ণ* বাঙালির প্রকৃত কাব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, *রামায়ণ*, *শ্রীকৃষ্ণ বিজয়*, *পরাগলী মহাভারত*, *ছুটিখার মহাভারত* প্রভৃতি গ্রন্থে বড়ু চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস ওঝা, মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস, শ্রীকর নন্দী সংস্কৃত সাহিত্য অনুসরণে কাব্য রচনা করেন। কিন্তু তারা Matter of Bangal বা বাংলার বিষয় সংযুক্ত করেন।

সেই যুগে বহিরাগত শাসকরা বাংলা শাসন করেন। শাসকদের সঙ্গে আগত কিছু ফারসিভাষীরা এই উপমহাদেশে আসেন। এই শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই উপমহাদেশে অভিজাত শ্রেণির লোকজন ফারসি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা ইসলামিক তাত্ত্বিক কাজী রুকন উদ্দিন সমরকন্দী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত *হিন্দু যোগশাস্ত্র* অমৃতকুণ্ড প্রথমে ফারসি পরে আরবিতে অনুবাদ করেন। এর পরেই মুসলিম লেখকরা এগিয়ে আসেন বাংলা ভাষা সাহিত্য রচনায়।

ইউসুফ *জুলেখা*-র প্রণয়োপাখ্যানই বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কাব্য। পারস্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই শাহ মোহাম্মদ সগীর ১৫৩২ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে পারস্য কবি ফেরদৌসী জামী ও আনসারীর কাছ থেকে শোনা নবী ইউসুফ-জুলেখার প্রেমকাহিনি অবলম্বনে রচনা করেন *ইউসুফ-জুলেখা* প্রণয়োপাখ্যান। এটি মিশরীয় কাহিনি অবলম্বনে রচিত। শাহ মোহম্মদ সগীরের সমসাময়িক আরেক কবি সাবরিদ খান, তিনি রচনা করেন *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য। এটি বাংলারই একটি প্রণয়োপাখ্যান।

সংস্কৃত কাব্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত হলেও মুসলিম লেখকদের হাতে Matter of Bangal সাহিত্যের বিষয় হয়। ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর* কাহিনি আর সাবরিদ খানের *বিদ্যাসুন্দর* কাহিনি প্রায় একইরকম বলে গবেষকরা মনে করেন।

লাইলী-মজনু দৌলত উজীর বাহরাম খানের একটি সাড়া জাগানিয়া, হৃদয়হরণ করা প্রণয়কাহিনি। আরব দেশে এটি কল্পিত হলেও সে দেশে এই কিংবদন্তি চালু নেই। আরব দেশের হলেও বাংলা ভাষায় পরিবেশন ও আবহে রচিত হয় 'লাইলী-মজনু'।

নবী বংশ রচনা করেন ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি সৈয়দ সুলতান। তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক সাধক। *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও *বেদপুরাণ* আত্মস্থ করেই তিনি *নবী বংশ* রচনা করেন। অমুসলমানদের ইসলামি সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলাই ছিল *নবী বংশ* রচনার প্রধান লক্ষ্য। মুসলিম শাসকরা তাদের শাসনামলেই বাংলা সাহিত্য রচনা শুরু করেন। উল্লেখ্য, খাঁটি বাংলা ভাষায় বড়ু চণ্ডীদাস কর্তৃক *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* রচনাকালে বাংলায় (গৌড়ে) ছিল মুসলিম শাসক। তবে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মধ্যেই অসংখ্য হিন্দু সাহিত্যিকের অভ্যুদয় ঘটে এবং তাদের হাতে সেসময় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম দুজন কবি কাজী দৌলত ও আলাওল। তাদের সাহিত্যচর্চার কেন্দ্র বাংলাদেশ ছিল না, ছিল আরাকান। সে সময় সিলেট, চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু মুসলমান আরাকানে রাজ অমাত্যের স্থান দখল করেন। চট্টগ্রাম, সিলেটের যেসব ব্যক্তি রোসাঙ্গ রাজ অমাত্য হয়েছিলেন, তাদের উৎসাহে সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান হয়ে উঠেছিল বাংলা ভাষার সাহিত্যচর্চার অন্যতম কেন্দ্র। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষা তাঁরা তাদের সাহিত্যকর্মে যুক্ত করেন। তাই সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে পাঁচ ভাষার সমন্বিত সাহিত্য। মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত এই দুই কবির প্রভাবে পাঁচ ভাষার সমন্বয়েই সাহিত্য রচিত হয়েছিল।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বাইরে লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা হলেন দৌলত কাজী। দৌলত কাজী রচনা করেন *সতীময়না* বা *লোর চন্দ্রানী*। এই কাহিনি রচিত হয় হিন্দি কবি সাধনের কাব্য *মৈনামত* থেকে। তখনকার লোকসমাজ চিরদিনই প্রণয়কাহিনি শুনতে এবং রোমান্টিক প্রণয়লীলা জানতে আগ্রহী ছিল। দৌলত কাজী কিন্তু *সতীময়না* শেষ করে যেতে পারেননি। ২০ বছর পর অসমাপ্ত অংশ শেষ করেন কবি আলাওল ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে। সংস্কৃত কাব্যাদর্শে রচিত হলেও *সতীময়না* বিশুদ্ধ বাংলা কবিতা। তাই দৌলত কাজীকে গীতি কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলা যায়। তিনি প্রথম শক্তিশালী বাঙালি মুসলমান কবি এবং *সতীময়না* বা *লোর চন্দ্রানী* বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্মরণীয় সেকুলার বা ধর্মসংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রণয় কাব্য।

রোসাঙ্গ রাজসভার দ্বিতীয় কবি আলাওল। আলাওল পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। অনেক ভাষা, সংগীত ও নাট্যকলায় তাঁর দখল ছিল। আলাওলের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ রচনা *পদ্মাবতী*। এটির রচনা শেষ হয় ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে। মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আলাওল *পদ্মাবতী* কাব্য রচনা করেন। অযোধ্যা প্রদেশের জায়স গ্রাম নিবাসী মালিক মোহাম্মদ জায়গী রচিত *পদুমাবৎ* এর স্বাধীন অনুবাদ *পদ্মাবতী*। এটিকে ভাবানুবাদও বলা হয়।

আলাওল ছিলেন মাগন ঠাকুরের সভাসদ। কোরেশী মাগন ঠাকুর নিজে কবি ছিলেন। রচনা করেন *চন্দ্রবতী*। আলাওল মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আর একটি কাব্য রচনায় হাত দেন– *সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান*। *পদ্মাবতী* শেষ করার আগেই তিনি এটি রচনায় হাত দেন। এই কাব্যের দুই-তৃতীয়াংশ রচনার পরেই মাগন ঠাকুরের মৃত্যু হয়। ফলে আলাওলের জীবনে দারুণ দুর্বিপাক নেমে আসে। আলাওল সর্বস্বান্ত হন। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এই তিনটি গ্রন্থের পরে আরোও দুটি অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। তাঁর ষষ্ঠ ও শেষ রচনা *সেকান্দার নামা*। আলেক সান্দরের বিজয় অভিযান সম্পর্কে ইরানে যে গল্প গড়ে উঠেছে, তারই কয়েকটি এই কাব্যের বিষয়। আলাওলের মতো বিদগ্ধ, উচ্চবর্গের কবি বাংলা সাহিত্যে বিরল। আলাওল আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই ধারণার সত্যতা কোনো পুথিতে নেই।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি শাহ সগীর এবং তাঁর কাব্য *ইউসুফ-জুলেখা*। এটি একটি প্রণয়কাহিনি। দ্বিতীয় প্রণয়কাহিনি বাহরাম খান রচিত *লাইলী-মজনু*।

সপ্তদশ শতক শেষ হওয়ার পূর্বেই আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য-সাংস্কৃতির কদর কমে এসেছিল। কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়– আরাকান রাজ্যের বিশৃঙ্খলা, বাঙালি মুসলমানদের ক্ষমতা লোপ। ড. সুনীতি কুমার কানুনগোর মতে, ১৩০০ থেকে ১৩২৩ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গ সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের অধীনে আসে। এ সময় বাংলা সাহিত্যেরও প্রসার ঘটে।

মধ্য যুগের সাহিত্য ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ও হিন্দু ধর্ম এবং সামাজিক সংস্কার তাই প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল।

বাংলা সাহিত্যে *বিদ্যাসুন্দর* কাহিনির জয়জয়কার অষ্টাদশ শতকের শুরুতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্তত সাত-আটজন কবি *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য রচনা করেন। *বিদ্যাসুন্দর* পাঞ্জালী কাব্যের সূত্রপাত ষোড়শ শতাব্দীতে। দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যের প্রথম কবি। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরো দুজন কবি কৃষ্ণরাম দাস কবি বল্লম ও প্রাণরাম চক্রবর্তী *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য লেখেন। কবি শেখর বলরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, কবিরঞ্জন রায়প্রসাদ সেন, কবিরত্ন নিধিরাম আচার্য, রাধাকান্ত মিশ্র ও কবীন্দ্র চক্রবর্তী *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য রচনা করেন। *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র (রায়গুণাকর)। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মুখ্য কবি। *অন্নদামঙ্গল* এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য। মুকুন্দরামের কাব্য পরবর্তী সব মঙ্গল কাব্য রচয়িতাকে প্রভাবিত করেছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবিদেরও প্রভাবিত করেছিল।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মূল বিষয়: বিদ্যাশিক্ষা উপলক্ষে বিদ্বান গুরুর সঙ্গে ছাত্রীর প্রণয়। ভারতচন্দ্র শুধু বিদ্যাসুন্দরের কবি নন। *বিদ্যাসুন্দর* তাঁর *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের একটি অংশ মাত্র। ভারতচন্দ্র ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিনিধি। ভারতচন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও জমিদারি হারান এবং নিজ গুণে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ হয়েছিলেন। তিনি তিনটি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত, বাংলা ও ফারসি ভাষা তিনি তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেন। নবদ্বীপের রাজার আদিষ্ট হয়ে তিনি *অন্নদামঙ্গল* কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যের তিনটি খণ্ড। প্রথম খণ্ড– *অন্নদামঙ্গল*, দ্বিতীয় খণ্ড–*বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল*, তৃতীয় খণ্ড–*মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল*। তাই বলা চলে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে মুসলিম লেখকদের প্রভাব লক্ষণীয়। ভারতচন্দ্র বাঙালি কবি ছিলেন। তাঁর মাতৃভাষা ছিল বাংলা। তিনি যেহেতু আরবি, ফারসি, হিন্দি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তাই তাঁর কাব্যে সাহসিকতার সঙ্গে অন্য ভাষার শব্দভাণ্ডার সাদরে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ভারতচন্দ্রসহ আরো কয়েকজন কবি এসে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটান। শুরু হয় আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যচর্চা।

লেখক: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

এক খণ্ড নিজস্ব জীবন

জাকির আবু জাফর

কিছু বৃক্ষ আছে আমার বুকের ভেতর–কিছু হৃদয় গহীনে
বাকি সব থরে থরে সজ্জিত মনের বাগানজুড়ে
যাদের ছায়ার জলে ভিজাই আমার ব্যক্তিগত দিন
আমার এক খণ্ড নিজস্ব জীবন
যা শব্দহীন শব্দের এক গোপন পাণ্ডুলিপি
আমার যুবক সকালগুলো মায়াবীনি সন্ধ্যাগুলো এবং
থোকা থোকা নক্ষত্রময় রাতগুলো ভীষণ রহস্যজালে বন্দি
ভাবলেই দেখি আমার আমিকে ছাপিয়ে তীব্রতর হয় চোখের জল
সহসা কপোল বেয়ে নেমে আসে অশ্রুর নদী
হৃদয় অথবা রুমাল মুছে দেবার সাহস নেই কারো
হেনার গন্ধের মতো ছড়ানো বাতাস–ঢুকে পড়ে আমার বুকের ভেতর
স্মৃতির উদ্ভ্রান্ত পাখির মতো
কেউ যেন ডাকে–ডেকে কি যেন বলে
পিছু ফিরে দেখি–কেউ নেই–কিছু নেই
তবুও থাকার মতন এমন অনুভব কেনো!
কেনো পাশ ফিরে দেখার মতন জেগে থাকে কেউ
তারই উষ্ণতা জাগে পাঁজরের পাশে
কান পাতি বুকের কাছে–কে যেন ফোঁপায় বুকের ভেতর
কে যেন উগ্রায় একান্ত গোপন আর্তি
বেড়ে ওঠা বৃক্ষে শোঁ শোঁ সময়ের শিস
মনে হয় বৃক্ষের শরীরে কোনো এক নদীর স্রোত
বয়ে যায় সবুজ বাতাস যায় চঞ্চল জলের মতন
প্রাচীন নদীর রহস্য আমার বুকের ভেতর বহমান
এসব প্রেমের চিত্র–দেখে দেখে চোখ হয়ে গেছে সূর্যের পাখি
ছায়ার শরীরে আছে কিছু বৃক্ষের ধ্বনি–কিছু শব্দের লীলা
নৈঃশব্দ্যের গোপন চোখের ইঙ্গিত
নিতান্ত শূন্যতা অথচ কী অবাক অশরীরী স্পর্শের টান
যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা প্রেমাচ্ছন্ন বাঁশির সুর
হৃদয়ের রহস্যের মতো–ঘোরাক্রান্ত কোনো সুতো যেন মূল শুদ্ধ টানে
আমি যাই বৃক্ষের বুকের কাছে–বৃক্ষ আসে আমার বুকের ভেতর
এমন আচ্ছন্ন ঘোরে–আমরা দুজন মিশে আছি দুজনের সাথে
যেমন জলের বুকে মিশে থাকে জলের শরীর

অপেক্ষারা দাঁড়িয়ে

জুননু রাইন

অপেক্ষারা দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে আমার জন্য
এক ঝুঁড়ি ক্লান্তির ঝরা ফুল নিয়ে
আমার অলসতা দেখে নিরলসভাবে জড়ো হচ্ছে–
সারি বেঁধে ঘেরাও করার প্রস্তুতি নিচ্ছে;
আমি আমার ক্লান্তিগুলোকে জোড়ালো হতে দেখছি
আমাকে পৃথিবীর শীতল ছায়ায় ম্লান করে নিতে
অপেক্ষারা দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে আমার জন্য
এক ঝুঁড়ি ক্লান্তির ঝরা ফুল নিয়ে।

আঁধার আলো

রওশন ঝুনু

আমিও চৌচির হই ভেতরে ভেতরে,
একেবারে একাকী নিকষ অন্ধকারে!
মগজে-মননে-সংঘর্ষণে বিন্দুও জ্বলে না আলো
কেবলই আগুন, ধূপ-ধোঁয়া পোড়া ছাই;
নাই উষ্ণতা, উত্তাপ এতটুকু কোনোখানে
শুধু শীতকাতরতা, শুধু হিম-আকুলতা জানে
জমেছে শূন্যতা বরফপর্বত লৌহকঠিন দুর্গম হাহাকার!
ছায়া নেই কোথাও, শুধু রোদ্দুর, তাপদাহ,
তবুও গলে না জল একফোঁটা
তবুও জ্বলে না আলো থাকা, আঁকাবাঁকা
দেহভঙ্গিমা...
আমাকে দেখো, আমাকে দেখো, আর্তচিৎকার সমান্তরাল
শুয়ে থাকে রেললাইন
একা একা বহুদূর...
এখানে থাকে না বাতিওয়ালা, ঢং ঢং স্টেশন মাস্টার
নেই হাঁটাহাঁটি পদচারণ, নির্জন প্লাটফর্ম,
ঘুটঘুটে আঁধার নির্বাক আঙিনামন;
কেউ তা দেখে না, কেউ তা জানে না,
ঝিঁঝিঁও রাখে না খোঁজ,
হিম শীতলতা ফেটে চৌচির,
আমিও চৌচির তবু রোজ রোজ...

নষ্ট নীড় কারাগার

নির্মল চক্রবর্তী

কিসের এত কান্না
কেন এত যন্ত্রণাদগ্ধ পোড়ামাটির জীবন
অদৃশ্য পথে বেহিসেবি জীবন চলে যাবে,
অপেক্ষার পালা শুধু
চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে শুভ্র হিমালয়ের মতো শরীর
তপস্বী সেজেছ?
নোংরা জীবন ছেড়ে চলে আসবে
আলোকিত পথে শোনোনি কখনো।
দিন দিন তোমার শরীরে জমা হচ্ছে
এবি নেগেটিভ ও এইডসের রক্ত
তুমি এখন হালকা গৃহে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছ
তোমার নিঃশব্দ কান্না থেমে গেছে
উর্ধ্বমুখী পারদের মধ্যেই তোমার জীবন
তুমি উদাসীন নিঃসঙ্গ একাকী।
পাণ্ডুরবর্ণ দেহকে আলিঙ্গন করেছ
ঝরা আগুনের বৈশাখি বেলায় জীবনকে
করেছ ঝাঁঝালো
এখন নিজেই বলছ, যৌবনের প্রারম্ভে হেঁটেছ
অনেক রোদ্দুরের পথ, কিছু পাওনি
সবুজের পাহাড়ের দিকে উঁকি দাও
দেখবে চারদিকে ফসলের মাঠ
সূর্যও উঁকি দেয় কখনো সখনো
হিমেল বাতাস স্পর্শ করে এগিয়ে চল
তোমাকে দেখতে চাই না, জানতেও চাই না
বিপন্ন সন্দেহপরায়ণ জীবন নিয়ে
বেঁচে থাক নষ্ট নীড় কারাগার।

জয়তু চন্দ্রাবতী

লিলি হক

বাবা দ্বিজবংশী দাশ, মা সুলোচনা। ১৫৫০ সালে জন্ম নেয় চন্দ্রাবতী। আজন্ম পিপাসার্ত, কথা ও কবিতার সাথে যার বসবাস, সোমেশ্বরী, কংশ, মগড়ার জলে ভাসা হাওর কন্যা এই আমি 'চন্দ্রাবতী পালা' পড়তে পড়তে ভালোবাসাকে ভালোবেসে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে চন্দ্রাবতীর মাঝে লীন হয়েছি, আর ভেবেছি মাথার উপর নীল আকাশ, চারকোনা পুকুরের পাড়ে ঢেউ খেলানো বাতাস, চোখ ভরা স্বপ্ন, বুক ভরা ভালোবাসা নিয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলাম, রংধনু রং শাড়ির আঁচলে তোমার হৃদয় রাঙিয়ে নিলাম। কাছে আছ তাই মনের আনন্দে ফুল কুড়াই, তুমিও কেমন ডাল নামিয়ে ধরো যেন আঁচল ভরা ফুলে বাড়ি ফিরে যাই।

পরিচয় পর্ব :

ডাল যে নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ সাথী
তুলিল মালতী ফুল কন্যা চন্দ্রাবতী

পরিচয় প্রাতে আমরা দেখি রাগ-অনুরাগের শাশ্বত রূপ আর কতক্ষণ চুপচাপ অনুসরণ, চন্দ্রাবতী ভাবে কিছুক্ষণ, অলি আর ফুলকলির মতন, চৈত্র-খরায় পুড়ছে দেহ, নাম-ঠিকানা জানে না কেউ, বরষা পেলে ফোটছে নাগেশ্বর সেই কি প্রাণেশ্বর ! জুঁই, মালতি গোপন প্রণয়, কে তুমি যুবক, কি জানি পরিচয়। চোখে চোখ উষ্ণ নিশ্বাস, প্রচণ্ড বিশ্বাস। রূপকুমার না রাজকুমার কি বা নাম তোমার, চার কোনা শান্ত পুষ্কুনীর শীতল জলে দুষ্টু নাগরের মতন ঢিল ছুঁড়ে অস্থির করলা, করলা তরঙ্গায়িত স্রোতস্বিনী প্লাবিত। প্রভাতে ফুল তুলতে এসে সুদর্শন তরুণ জয়ানন্দকে দেখে চন্দ্রাবতী বলে,

'চাইরকোনা পুষ্কুনীর পাড়ে চম্পা নাগেশ্বর
ডাল ভাঙ্গা পুষ্প তুল কে তুমি নাগর।'

চন্দ্রাবতীর রূপে মুগ্ধ-বিস্মিত-বিস্ফারিত চোখে থর থর আবেগে জয়ানন্দ বলে,

'আমার বাড়ি তোমার বাড়ি ওই না নদীর পার
কি কারণে তুল কন্যা মালতীর হার।'

চন্দ্রাবতী বিনীত কণ্ঠে জানায়, বাবা শিব পুজো করবেন, এ জন্য আমি প্রতিদিন ফুল তুলতে আসি।

'এক দুই তিন করি দিন যে যায়,
সকাল সন্ধ্যা ফুল তুলে কেউ না দেখতে পায়।
ডাল যে নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ সাথী,
তুলিল মালতী ফুল কন্যা চন্দ্রাবতী।'

প্রথম দর্শনেই প্রেম। হাওরের জলের মতো উচ্ছল অথচ শক্তিশালী এদেশের নারীত্ব অবাধ নির্মল যে প্রেম, সে প্রেম বিরহেও উজ্জ্বলতা হারায় না, বেদনায়ও ভেঙে পড়ে না, তার তো পরাজয় নেই। ভালোবাসা চন্দ্রাবতীর এই প্রেমের কাছে সবকিছু সমর্পণ করে দিয়েছে, এই সখ্যতা আরো মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে। চারকোনা পঙ্কুনীর পাড়ে নির্জন ফুলবাগানে দুটো প্রাণের কুহু কূজনে মুখর হয়ে উঠেছিল আমার প্রিয় মৈমনসিংহ গীতিকার হাওর-বাঁওড় এলাকার প্রেমময় নরনারীর কী অপূর্ব প্রেমের অজেয় ফল্গুধারা। এ যুগলবন্দী প্রেম উচ্ছৃঙ্খলতা নয় তা বিশেষভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে, এ প্রেম অ্যাসিড নিক্ষেপ, খুন, ধর্ষণের নয় বলে দিলাম ! প্রখ্যাত লোকবিজ্ঞানী ড. আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছেন, চন্দ্রাবতীর এ প্রেম অরণ্য পুষ্পের মতোই পবিত্র। নাগরিক সভ্যতার কোনো ধুলোবালি এই পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে না। এখানে বিয়ের চেয়েও বড়ো হলো প্রেম বা `Selection of Partner'। মায়ার অবিশ্বাস্য অংশে বাস্তবতার রং পড়েছে এবং ধীরে ধীরে লোক ঐতিহ্যের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় হরণ করেছে। যৌবনের ধর্ম যে সকাল দুপুর-বিকেল-সাঁঝে, জয়ানন্দের কথা হাসি রূপ ছবি আঁকে হৃদয় মাঝে, চন্দ্রাবতীর আহার, ঘুম, উপবাস, দিন, সব হয়ে যায় জয়ানন্দের মধ্যে বিলীন।

একদিন তুলি ফুল মালা গাঁথি তায়
সেইতো না মালা দিয়া নাগরে সাজায়।

নির্ঘুম রাত পোহালেই সাঁজি হাতে, সযত্নে কুড়িয়ে আনা বনকুসুমের মালা গেঁথে পরিয়ে দেয় লাবণ্যময়ী চন্দ্রা তার প্রেমের ঐশ্বর্যে লালিত স্বপ্নকুমার জয়ানন্দকে। মনের মানুষকে সাজায় প্রেমের আলপনায়, সেই মালা আর শিহরিত মৌ বনে ভরা যৌবন নেচে গেয়ে বলে যায় কানে কানে 'ভাবতে ভালো লাগে তোমারে বর্ষণমুখর আঁধার রাতে কিংবা কুয়াশা ভেজা শীতের সকালে, বাড়ির আগে দুর্বাঘাসে নরম পা

কবি চন্দ্রাবতী শিব মন্দির

ভিজিয়ে হাঁটতে হাঁটতে। ভাবতে ভালো লাগে ভালোবাসার চাদরে তোমায় আবৃত করতে, তুষ্ণার্ত ঠোঁটগুলো ভিজিয়ে দিতে, পুড়িয়ে দিতে। দিনের পর দিন যায়, কেউ না দেখতে পায়, সকাল সন্ধ্যা ফুল তোলে লোকচক্ষুর আড়ালে, কতটা দহন হলে মনের আগুন জ্বলে, কতটা কষ্ট পেলে সুখ হারিয়ে ফেলে। প্রাণনাথ যদি তা বোঝাতে পারতাম, মনে হয় তোমার ভালোবাসার বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছি, প্রাণ উজাড় করা অফুরন্ত প্রণয়ে নিজেকে হারিয়েছ। চন্দ্রাবতী ফিরে পাবে কি তার হারানো সুখের অস্তিত্ব, নাকি সোহাগ-আলিঙ্গনের-কামনায় নিভৃত অপেক্ষায় থেকে থেকে অজেয় প্রেমের সমাধি হবে রচিত। ভেজা ভেজা পাপড়ি ফোঁটানো দিন, তোমার কাছে রইল আমার আধেক জীবন ঋণ। বাপের আদরের কন্যা আমি, তার মনে আঘাত দিতে না জানি। নিঃসঙ্গ যাত্রায় ওগো পথিক ভুল করে এখানে এসো না, রক্তজবা, নাগেশ্বর, মালতীর বাগানে তোমার চন্দ্রারে খুঁজো না, নিষ্ঠুরের মতো আধো ফোঁটা ভীরু কলিটি ছিঁড়ো না, কারণ সে তো সুবাস বিলাবেই, তাকে ফুটতে দাও। যে ফুল ঘরের ফুলদানিতে তুলে রাখতে পারবে না সেই ফুলের ঘ্রাণ নিয়ে কি লাভ আমি জানি না, যত্রতত্র সখা ছড়িয়ে পড়ুন কাজলকালো আঁখির লোনাজল, তারে এতটুকু মনে করে কখনো হয় না চঞ্চল।

পত্রালাপ পর্ব:

পরথমে লিখিল পত্র চন্দ্রার গোচরে
পুষ্পপাতে লেখে পত্র আড়াই অক্ষরে
পত্র লেখে জয়ানন্দ মনের যত কথা
নিতি নিতি তোলা ফুলে তোমার মালা গাঁথা

তোমার গাঁথা মালা লইয়া কন্যা কান্দিলো বিরলে
পুষ্পবন অন্ধকার তুমি চইলা গেলে।

ভালোবাসার মানুষকে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য আজকের তথ্য প্রযুক্তির কালে জয়ানন্দরা এসএমএস, ফেইস বুক, ই-মেইল, সুদৃশ্য কার্ড ব্যবহার করে থাকেন। সাড়ে তিনশত বছর আগে লোকমুখে গীত চন্দ্রকুমার দে-এর সংগৃহীত একশত পঁচানব্বই বছর পূর্বে যখন ড. দীনেশ চন্দ্র সেন অবিস্মরণীয় এই গীতিকা সম্পাদনা করেছেন। আমরা দেখতে পাই– তখনকার নায়ক-নায়িকাদের পত্রালাপ হতো পুষ্পপাতে বিভিন্ন পাতার রসে এক ধরনের কালি দিয়ে বাঁশের কঞ্চির কলমে। সব কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না জয়ানন্দ। সুখ আনন্দ সব হারিয়ে কিসের মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে দিনরাত্রি। তাই সে ভাবছে, কে এই ফুলকুমারী যে আমার হৃদয় মন্দিরে আসন পেতেছে। চন্দ্রকলার মতন চন্দ্রার মুখের আদল সারাক্ষণ চোখের তারায় ঝিকমিক করে। গাছের শাখে পাখির কিচিরমিচির সুরে চন্দ্রার কণ্ঠমিশ্রিত কথা গভীর রাতে ঘুম ভাঙানো সুরে জয়ানন্দকে জাগিয়ে রাখে। কী গভীর ভালোবাসায় প্রেমপত্র লেখে চন্দ্রাবতীর কাছে। জয়ানন্দ প্রেমপত্রে যা লিখেছে তা সব দেশের, সব যুগের, সব সাহিত্যে চরম ও পরম কথা, প্রেমের এই কূলহীন সাগর– কেউ কি এর তল পেয়েছে ! জয়ানন্দও এ প্রেমনদীতে ডুবে গেল। পত্রের মধ্য দিয়ে চন্দ্রাবতীর মনের কথাও জানতে চায়। পরদিন ভোরবেলা পুষ্পপত্রে লেখা সেই পত্র চন্দ্রাবতীকে দিয়ে চলে যায়।

'পূজার যোগাড় দিয়া কন্যা নিরালায় বসিল
জয়ানন্দের পুষ্পপাত যতনে খুলিল।
পত্র পইড়ে চন্দ্রাবতীর চক্ষে বয় পানি
কিবা উত্তর দিব কন্যা কিছুই না জানি।
আর বার পড়ে পত্র চক্ষে বয় ধারা
এমন কেন হইল মন শুকের পিঞ্জরা।
দেখি শুনি সেই ভাল ফুল তুল্যা আনি
বয়স হইয়াছে এখন হইলাম অরক্ষিনী।
জৈবন আইল দেহে জোয়ারের পানি
কেমনে লিখিব পত্র প্রাণের প্রেমকাহিনি।
কিমতে লিখিব পত্র বাপ আছে ঘরে
ফুল তুলে জয়ানন্দ ভালবাসি তারে।
ছোট হইতে দেখি তারে প্রাণের দোসর
সেইভাবে লেখে কন্যা পত্রের উত্তর।

কম্পিত বক্ষে পত্রখানি ধরে একলা ঘরে নিরালায় বসে নায়িকা চন্দ্রাবতী, অর্থাৎ তার পরাণের পাখিকে পত্র লিখেছেন। সুঠাম দেহের অধিকারী যুবক জয়ানন্দ-প্রেমের সাগরে জল থই থই প্রণয় লিপিকা। জীবনে প্রথম ভালোবাসার পরশ। আবেশমাখা পত্র, আনন্দ-ভয় মিশ্রিত দোলা লাগে প্রাণে। তার প্রাণেশ্বরীকে মর্মবেদনা বুঝানোর ভাষারাও লাজ নম্র শিহরণে আচ্ছাদিত। জগতের যত রাগ-রাগিনী বিরহের সুরে পাতিয়া কান, যৌবন জ্বালায় করে আনচান, রাত কোকিলের ডাক শুনে, কামনার মণি দীপ আহরণে ডুব সাঁতারে উথালপাথাল আকুল প্রাণ। জোছনা রাতে বয়ে চলে হাওরের জল, সেই জলে মেশে পত্র পাঠে কন্যার চোখের জল। যৌবনকালের প্রেমেপড়ার চিন্তা পৃথিবীর সব চিন্তার চেয়ে বড়ো। যিনি সত্যিকার প্রেমে পড়েছেন তিনিই বুঝবেন এর যে কী অসহ্য দাহন, তুষের আগুনের মতন ধিকিধিকি জ্বলতেই থাকে। আমেরিকান 'Jew's Daughter'-এর মতোই চন্দ্রাবতীও ব্রাহ্মণকন্যা। এখানে চন্দ্রাবতী তার নিজের স্বামী বেছে নিতে পারে না। পিতা নিজেই বর মাগে 'ভাল ঘরে ভাল বরে কন্যার হউক বিয়া।' অজন্তা গুহার চিত্রের মতোই কিংবদন্তির নায়িকা আমাদের চন্দ্রাবতী। জয়ানন্দকে গভীরভাবে ভালোবেসেও মনের কথা বলতে পারে না। তাই জয়ানন্দ যখন তাকে পত্র লেখে সে অতি বিনয়ের সাথে উত্তর লেখে,

ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী।

পত্রের উত্তর এরকমভাবে লিখলেও চন্দ্রাবতী তার প্রেমকুমার জয়ানন্দকেই স্বামী হিসেবে পাওয়ার জন্য মন্দিরে গিয়ে শিবের কাছে প্রার্থনা করে। তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়, পূজোর ফুল কুড়াতেও আর যায় না। চুপি চুপি মনের অজান্তে জয়ানন্দকে হৃদয় দান করে দিশেহারা চন্দ্রাবতী। চন্দ্রার বাবা কবি দ্বিজবংশী দাশ দুটো প্রাণের মন দেওয়া-নেওয়া কিছুই জানতে পারে না। এভাবেই দিন যেতে থাকে। একদিন বিয়ের প্রস্তাব এলে ব্রাহ্মণপুত্র জয়ানন্দের জাত-কুল দেখেশুনে কন্যাপক্ষ সম্মত হয়। বরপক্ষও চন্দ্রার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে আগ্রহের সাথে এগিয়ে আসে। কষ্টিবিচারসহ জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে বিয়ের আয়োজন করা হয়। হঠাৎ ঝড় নেমে এল, তুমুল ঝড়। জয়ানন্দ ধর্মান্তরিত হয়ে জয়নাল নাম নিয়ে আশামণি নামে এক মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে। খবর চলে আসে চন্দ্রাবতীর কাছে। শৈশবের খেলার সাথি, বাল্যকালের ফুল কুড়ানোর সাথি, কৈশোরের ঘুরে বেড়ানোর সাথি, যৌবনের প্রথম প্রেম, যাকে ঘিরে সেই জয়ানন্দ একি করেছে! মাথার শিরা দপ দপ করতে থাকে। পৃথিবীটা ঘুরছে, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। তার স্বপ্নের ঘর, সমস্ত অস্তিত্বজুড়ে যার অবাধ বিচরণ। এতদিনের পরিচয়ে যাকে কোনোদিনই স্পর্শ করেনি, ভালোবাসার নদীতে কল্পনায় মাছের মতো সাঁতার কেটে যাদের দিন কাটছিল ঘর বাঁধার আমন্ত্রণে। সেই জয়ানন্দ ছিটকে পড়েছে তার হৃদয় আকাশ থেকে, জগতের অন্য কোথাও। এও কী সম্ভব ! চন্দ্রাবতীর কষ্টে সখীরা চোখের জল ফেলে, কিন্তু চন্দ্রাবতী যেন বোবা হয়ে যায়। অনুভূতিহীন এক হীরক ভাস্কর্য। কারো সাথে কথা নেই– হাসি, কান্না নির্বাসন দিয়ে খাবার বন্ধ করে দেয়। রাতের বিছানাটা যেন মৃত্যুশয্যা। মনে পড়ে সকল মধুমাখা স্মৃতি। সেই ফুল কুড়ানো, অকৃত্রিম প্রেম, চার চোখের মিলন, সুচারু নখে যেমন রক্তজবা নেলপলিশ লেগে থাকে ঠিক তেমনি স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকা, চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে বালিশে।

বিভিন্ন স্থান থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে কিন্তু চন্দ্রাবতীর আর বিয়ে করার ইচ্ছে নেই।

চন্দ্রাবতী বলে "পিতা মম বাক্য ধর।
জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবর॥
শিবপূজা করি আমি শিবপদে মতি।
দুঃখিনীর কথা রাখ কর অনুমতি॥"
অনুমতি দিয়া পিতা কয় কন্যার স্থানে।
"শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে॥"

জীবনের প্রথম প্রেম ব্যর্থ হওয়ায় চন্দ্রাবতী স্বভাবতই দারুণ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মুষড়ে পড়ে। চন্দ্রাবতী বৈরাগ্য জীবনের সিদ্ধান্ত নেয়। আজীবন কুমারী থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে বাবাকে বাড়ির পাশে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। স্নেহময় পিতা তার দুটো অনুরোধই রক্ষা করে। একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বলেন, 'শিব পূজা করো আর লিখ রামায়ণে।' তার ভালোবাসার মর্যাদা দিতে গিয়ে এই স্বেচ্ছা নির্বাসন। ভালোবাসার রূপ এমনি হয়, সকল ভালোবাসার মিলন ঘটে না, তবে সত্যিকারের প্রেমে জগতের সকল ধন, ঐশ্বর্য ম্লান হয়ে যায়। প্রখর সূর্যের তাপের মতোই দেদীপ্যমান নায়িকা চন্দ্রাবতী জাগতিক ভোগ, লালসা ত্যাগ করে মনকে শান্ত রাখার জন্য ধর্মকর্মে মনোনিবেশ তথা 'পিতার আদেশকে শিরোধার্য করে' রামায়ণ রচনায় নিজেকে সমর্পিত করে। আমাদের লোকসাহিত্যে লোক নায়িকাদের মধ্যে চন্দাবতী এক আলোকবর্তিকা। বাবা দ্বিজবংশী দাশ ছিলেন

শিক্ষিত ও কবি। তাই চন্দ্রাবতী শিক্ষার পথে এতটা অগ্রসরমান ছিল এবং সে শিক্ষার আলোয় তার মন ও মেধাকে বর্ণমালায় সাজাতে পেরেছে। কাগজ আর কলমের মিলনে ঝরনাধারার মতো লিখে যায় শাশ্বত প্রেমকাহিনি *রামায়ণ*। *রামায়ণ* ব্যতীত চন্দ্রাবতী *দস্যু কেনারামের পালা* এবং *মলুয়ার পালা* রচনা করেছে। পিতা-কন্যা একসাথে বসে রচনা করেছে *মনসা দেবীর ভাসান*। সীতার বনবাস পর্যন্ত লেখা শেষ, ফাঁকে ফাঁকে লেখা হয় অসংখ্য কবিতা ও লোকগীতি। ঠিক তখন চন্দাবতীর জীবনে নেমে আসে পৃথিবীর সবচেয়ে করুণতম মুহূর্তটি। প্রেমিক জয়ানন্দ তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে একখানা পত্র পাঠালো চন্দ্রার কাছে।

শুনরে প্রাণের চন্দ্রা তোমারে জানাই।
মনের আগুনে দেহ পুড়্যা হইছে ছাই।
অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল।
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল-হলাহল॥
জানিয়া ফুলের মালা কালসাপ গলে।
মরণে ডাকিয়া আমি আন্যাছি অকালে॥
তুলসী ছাড়িয়া আমি পূজিলাম সেওরা।
আপনি মাথায় লইলাম দুঃখের পসরা॥
জলে বিষ বাতাসে বিষ না দেখি উপায়।
ক্ষমা কর চন্দ্রাবতী ধরি তোমায় পায়॥
একবার দেখিব তোমায় জন্মশেষ দেখা।
একবার দেখিব তোমার নয়নভঙ্গি বাঁকা॥
একবার শুনিব তোমার মধুরসবাণী।
নয়নজলে ভিজাইব রাঙ্গা পা দুইখানি॥

জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে এবং শেষবারের মতো একবার তাকে চোখের দেখা দেখতে চায়। জয়ানন্দের পত্র পড়ে চন্দাবতী চোখের জলের সাগরে ভাসে– যে সাগরের কূল নাই, কিনার নাই। অন্তরে ভেসে ওঠে মধুর প্রেমের স্মৃতি। চন্দ্রা বাবাকে জানায় জয়ানন্দ একবার তাকে দেখতে চায়। বাবা কঠোরভাবে বললেন, সম্ভব নয়। বাবার নির্দেশ মেনে চন্দ্রা চিঠির জবাবে অসম্মতি জানায়। বাবার কথা মেনে চন্দ্রাবতী একমনে শিবের পুজো করে যায়। অনুতাপে উদভ্রান্ত জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর মন্দির দুয়ারে কপাল ঠেকিয়ে আঘাত করে এবং কাতর কণ্ঠে দরজা খুলতে বলে। 'দ্বার খোল চন্দ্রাবতী দেখা দেও আমারে'।

না ছুঁইব না ধরিব দূরে থাক্যা খাড়া।
পুণ্যমুখ দেখ্যা আমি জুড়াইব অন্তরা॥

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। চন্দ্রাবতী প্রতিজ্ঞায় অবিচল। চিরদুঃখী জয়ানন্দ তখন মন্দির আঙিনায় ফুটে থাকা সন্ধ্যা মালতীর রস নিংড়ে বন্ধ দরজার উপর চার লাইন কবিতা লিখে চলে যায়।

শৈশবকালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের সাথী।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী॥
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলা সম্মত।
বিদায়মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত॥

মন্দিরের দুয়ার খুলে চন্দ্রাবতী এ লেখাটি পড়ে এবং মুছে ফেলার জন্য নদীর ঘাটে যায় পানি আনতে। সখিরা কেউ সাথে নেই, চন্দ্রাবতী একা। সে দেখে তার ভালোবাসার মানুষ, প্রেমিক জয়ানন্দের মৃতদেহ নদীর ওপর ভাসছে। এই অবস্থা দেখে তার বুক ফেটে যাওয়ার উপক্রম। চোখে নামে বাধভাঙা জলের ধারা। মরণ সমান কষ্টে জর্জরিত চন্দ্রাবতী অল্পদিনের মধ্যেই দেহত্যাগ করে। লোকমুখে শোনা যায় চন্দ্রা নিজেও জয়ানন্দের মতোই সেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে। এ কথাটি প্রমাণিত সত্য নয়, তবে এটা ঠিক জয়ানন্দের এই করুণ পরিণতি চন্দ্রাবতীকে অসহ্য যন্ত্রণায় শেষ করে দিয়েছিল। সীতার বনবাস পর্যন্ত লেখা রামায়ণ আর শেষ করা হয়নি।

তার লেখা *রামায়ণ* একসময় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই পাণ্ডুলিপিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুরক্ষিত আছে। সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হওয়ার জন্যই সকল গোত্রের মানুষের কাছে পালাটি অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ ও সাহসী প্রেমকাহিনি বলে কালের মন্দিরায় অবিনশ্বর ! অমর প্রেমের ধ্বংস নেই। 'আমাদের নদনদী বিলঝিল হাওর চিরন্তনী মানবতা রসে পরিপূর্ণ। বনজঙ্গল, গ্রামগঞ্জ, আমাদের কদম-কেতকী, বন-দোপাটি, নাগকেশর এবং মল্লিকা-মালতীর বনের ধারে আমাদের ঘরের বেদনা, মনের বেদনা ও প্রাণের স্নিগ্ধতা নিয়ে যেন এদের আগমন। চন্দ্রাবতীর দেখা কোনো ধেনু-চরানো বেনু কুঞ্জের ধারে আজও বুঝি হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে পারে।' চন্দ্রাবতীকে যেন আমরা সকলেই চিনি। 'চন্দ্রাবতী' সমগ্র প্রেমকাহিনির সেই যেন কেন্দ্রবিন্দু 'সদ্যফোটা ফুলের মতোই তার রূপ। কোনো অখ্যাত গ্রাম প্রান্তে, অথবা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, মধুমতি, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, কংশ, সোমেশ্বরী, মগড়ার পাড়ে জয়ানন্দের আকুতি চন্দ্রাবতীর চরণে বলিদান। কী অসম্ভব ও মানসিক শক্তির বলে বলীয়ান হতে পারলে রেশমী আর রূপের আড়ালে নিজেকে লৌহমানবী হিসেবে গড়ে তোলা যায় যাপিত জীবনে এ সংসার মায়াজাল ছিন্ন করে, সুখ শান্তির জীবনকে বিসর্জন দেবার মতো কতটা ইস্পাতকঠিন ইচ্ছায় নিজকে করা যায় মহিমান্বিত, কন্যাত্ব, প্রেমত্ব, সতীত্ব, নারীত্ব, স্থিরতা, ধীরতা, পেলবতা, কমনীয়তা, স্নিগ্ধতা সূচিতার উদাহরণ স্বরূপ। সব মিলিয়ে সর্বোপরি চন্দ্রাবতী গাথা পালা বাংলা সাহিত্যে একক সন্ধ্যাতারা বা নিভৃত কামিনীর মতোই ফুটে উঠেছে। আমাদের গ্রামবাংলার শুধু নয় সমগ্র বাংলাদেশের নারীত্বে প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে আগামীর আমন্ত্রণে।

চন্দ্রাবতী-জয়ানন্দের প্রেমের গাথা গেয়ে গ্রাম-পাড়া-মহল্লা-মাঠ ছাড়িয়ে পথের পরে পথ পেরিয়ে শোকাভিভূত হয় আকুল প্রাণের ব্যাকুল বেদনায় পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা পেরিয়ে আটলান্টিক, মিসিসিপি, নায়েগ্রার জলপ্রপাতের পাড়ের মানুষগুলো। বাংলার অশিক্ষিত কৃষক কবির বেদনা আজ সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের মণি পান্নার রত্নের আকর হয়ে কালের বক্ষে যে শাশ্বত সুন্দরের প্রতিভূ হতে পেরেছে তার গৌরবও তো কম নয়। এ লেখাটি রচনা করতে বসে বার বার মনে হয়েছে প্রেম সার্বজনীন সর্বকালের, সকল মানুষের, হোক সে কৃষক হোক সে রাখাল সকলেই তো মানবকুলে জন্ম নেওয়া সন্তান। চন্দ্রাবতী-জয়ানন্দ যেন আমাদের এই মহান সত্যটি বার বার হাতছানি দিয়ে ডেকে বলছে। সবকিছুর উপর হলো মানুষ, আর এই মানুষের প্রেম।

পীরিত যতন পীরিত রতন পীরিত গলার হার
পীরিত কইরা যেজন মইল সফল জীবন তার।

এই প্রেমের তীর্থে অনাদিকালের স্মৃতির মিনার তৈরি করে চির কুমারিত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে পিতার আদেশে রামায়ণ লেখায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে আমৃত্যু আমাদের রূপসী চন্দ্রাবতী আজও মহাকালের ইতিহাসে সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের প্রতীক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রেম আদর্শ, উজ্জীবন ও সৃষ্টি যেন একযোগে একাকার চন্দ্রাবতী নামে। তাদের বিয়োগান্ত প্রেমের অপূর্ব কাহিনি হৃদয় বিদীর্ণ করে। যে প্রেমে মিলন নেই আছে মুক্তি, একদিকে যেমন বেদনার পাহাড় গড়ে ওঠে অন্যদিকে চন্দ্রাবতীর কাব্যপ্রতিভা আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। চন্দ্রাবতীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আসুন উচ্চারণ করি– 'এ জীবন পরিচর্যার, এ জীবন মমতার, এ জীবন সমতার, এ জীবন ভালোবাসার শুধুই ভালোবাসার। জয়তু চন্দ্রাবতী।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব

বীরেন মুখার্জী

যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ভাষা। যে-কোনো জাতির স্বকীয়তাও প্রমাণ করে, সে জাতির মধ্যে প্রচলিত সর্বজনীন ভাষা। ভাষিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ভাষাগোষ্ঠীও পৌঁছে যায় অনন্য উচ্চতায়। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র কিংবা ক্ষমতালোভীদের কূটচক্রান্তে এই ভাষা কিংবা ভাষিক জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ ও আন্দোলনই হয়ে ওঠে সচেতন ভাষাবাহীর সত্তাকে স্বাধীন করার একমাত্র পথ। বাঙালি জাতি ভাষাপ্রেমে পরীক্ষিত। হাজার বছরের বাঙালির জীবন প্রবাহে যেসব আন্দোলন, সংগ্রাম, গৌরবগাথা যুক্ত হয়েছে, বিংশ শতাব্দীর ভাষা আন্দোলন তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীও বিস্মিত হয়েছে বাঙালির ভাষাপ্রীতিতে। 'ভাষার জন্য আত্মত্যাগ' বাঙালিকে বিশ্বের মানুষের কাছে আদর্শিক ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানে দৃষ্টান্তরূপে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে, এ কথাও জোর দিয়ে বলা যায়।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা রক্ষার দাবিতে সক্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল নিয়ে আসেন ঢাকার রাজপথে। তারা প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। পুলিশ গুলি চালায় ছাত্রদের মিছিলে। নিহত হন তিনজন। পরদিন আবারও মিছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারির ওই মিছিলে পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারান রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার, সালাম। ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাতে শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মাণ করা হয় স্মৃতিস্তম্ভ। শাসকরা সঙ্গে সঙ্গেই ওই স্তম্ভ গুঁড়িয়ে দেয়। ক্রমে দ্রোহের এ আগুন সম্প্রসারিত হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। ভাষিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান দেশের প্রগতিশীল কবি-সাহিত্যিকরা। আর এসব প্রতিবাদ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে সাহিত্য।

তবে এই আন্দোলন শুরুর আগে অবরুদ্ধ ভাষা নিয়ে কবি আব্দুল হাকিম রচিত 'যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি' কবিতাটি মাতৃভাষা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রচিত সার্থক কবিতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আন্দোলন চলাকালে ২২শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বসে ভাষা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে মাহবুবুল আলম চৌধুরী রচনা করেন ১২০ লাইনের- 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' শিরোনামের কবিতা। দীর্ঘ কবিতাটি একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষার জন্য আত্মত্যাগকারী শহিদদের স্মরণে প্রথম এবং ভাষিক আগ্রাসনের ওপর লিখিত দ্বিতীয় কবিতা হিসেবে ধরা হয়। কবিতাটির কয়েক পঙ্‌ক্তি তুলে ধরছি-

> যে শিশু আর কোনোদিন তার পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে না
>
> যে গৃহবধূ আর কোনোদিন তার স্বামীর প্রতীক্ষায় আঁচলে প্রদীপ ঢেকে দুয়ারে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না
>
> যে জননী খোকা এসেছে বলে উদ্দাম আনন্দে সন্তানকে আর জড়িয়ে ধরতে পারবে না
>
> যে তরুণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে বার বার একটি প্রিয়তমার ছবি চোখে আনতে চেষ্টা করেছিল
>
> তাদের সবার নামে আমি শাস্তি দাবী করতে এসেছি।
>
> [কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি/ মাহবুবুল আলম চৌধুরী]

এরপর আন্দোলনকালীন সময়ে আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত 'স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো চার কোটি পরিবার/খাড়া রয়েছি তো!'- 'স্মৃতিস্তম্ভ' শিরোনামের এই কবিতাটিকে দ্বিতীয় এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনার ভাঙার দিনে লুৎফুর রহমান জুলফিকার রচিত ৬৩ পঙ্‌ক্তির দীর্ঘ কবিতাকে একুশের ওপর লিখিত তৃতীয় কবিতা হিসেবে ধরা হয়।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, তৎকালীন আর্য সভ্যতায় বসবাস করেও আর্য ভাষার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেন মহামতি গৌতম বুদ্ধ। তিনি অহিংসনীতি অনুসরণ করে স্থানীয় মুখের ভাষা 'পালিতে' 'ত্রিপিটক' রচনা করে বিদ্রোহের জবাব দেন। ভাষিক বিদ্রোহের এ ধারা বাঙালির ভাষা রক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। তবে সত্য এই যে, সংস্কৃতিগত মিল না থাকায় হাজার মাইলেরও বেশি ব্যবধানের একই রাষ্ট্রভুক্ত দুটি দেশের মানুষের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। দুটি পৃথক জাতি এবং পৃথক ভাষা। পূর্ববঙ্গে বসবাসকারীরা স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন। আর এটি বাংলা ভাষা। সংখ্যাগরিষ্ঠের এই বাংলা ভাষা, যার রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। প্রায় দু-শো বছর শাসনের পর ইংরেজরা যখন এ উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত হয় তখন অলিক এই রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনরা পূর্ববঙ্গের ওপর যে ভাষিক নিপীড়ন শুরু করেছিলেন তা থেকে মুক্তি পাওয়া ছিল বাংলা ভাষাভাষীদের বেঁচে থাকার প্রশ্ন। পরবর্তীতে বাংলাভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। যে মৌল ভিত্তির ওপর বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে, তা প্রাণের ভাষা- বাংলা ভাষা। দেশব্যাপী ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে কবিরাও লিখতে থাকেন তাদের অমর পঙ্‌ক্তিমালা-

> ফাগুন এলেই পাখি ডাকে
> থেকে থেকেই ডাকে
> তাকে তোমরা কোকিল বলবে? বলো।
> আমি যে তার নাম রেখেছি আশা
> নাম দিয়েছি ভাষা, কত নামেই 'তাকে' ডাকি
> মেটে না পিপাসা।
> [আসাদ চৌধুরী]

বস্তুত ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই বাঙালি জাতি পরাধীনতার জিঞ্জিরে বন্দি হয়ে পড়ে। বাঙালির আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা পরনির্ভরশীলতার ফাঁদে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় গোটা উপমহাদেশে 'ব্রিটিশ খেদাও' আন্দোলন তীব্রতর হয়। এ দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের পর বলতে গেলে 'মানচিত্রে পেন্সিলের রেখা টেনে ভারত ভাগ হয়'। তখন সেই অলীক রাষ্ট্রে পূর্ববঙ্গ নামের বাংলাদেশকে একটি পরমুখাপেক্ষী অঞ্চলে পরিণত করা হয়। সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয় গণতন্ত্রের মূলভিত্তিকে। উপরন্তু বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতি। ফলে ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালির মানসলোকে সবল, স্বতঃস্ফূর্ততা ও সত্য নিয়ে সামনে দাঁড়ায়। আর এই ভাষিক আন্দোলনে গণমানুষকে উজ্জীবিত করা- সাহসী করার শুদ্ধ উচ্চারণ এভাবেই উঠে আসে কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে-

> ওরা আমার মুখের কথা
> কাইরা নিতে চায়।
> ওরা, কথায় কথায় শিকল পরায়
> আমার হাতে পায়।
> [আব্দুল লতিফ]

দেশব্যাপী ছাত্র-শিক্ষক-জনতাকে ভাষিক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে রচিত হতে থাকে গান। গান একটি শ্রুতি মাধ্যম। গান দিয়ে অতি

সহজে মানুষের মননের কোষে ঝংকার তোলা যায়- চেতনা জাগানো সম্ভব হয়। যে কারণে বাঙালির ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন নিয়েও রচিত হয়েছে অনেক গান। গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে বাঙালি জাতির মুক্তির বারতা। যশোরের কবি শামসুদ্দীন আহমদ রচিত 'ভুলব না ভুলব না, ভুলব না আর একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না' গানটি ভাষার জন্য আত্মদানকারী শহিদদের ওপর প্রথম রচিত গান। তবে আব্দুল গাফফার চৌধুরী রচিত গানটিই বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কালের বিবর্তনে।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি।
[আব্দুল গাফফার চৌধুরী]

এই কবিতার বজ্রশাব্দিক দাবি সেদিন হয়ে উঠেছিল সমগ্র বাঙালি জাতির প্রাণের দাবি। কবিতার মাধ্যমেই আছড়ে পড়ল ক্ষোভ, দুমড়ে-মুচড়ে দিতে চাইল সকল অন্যায় অবিচার। সময়, চিত্রকল্প, ভাষাশৈলীর বিচারে কেউ কেউ এই কবিতাকে বলেছেন 'একুশের সেরা প্রতিবাদী কবিতা'। কারণ, তখনকার বিরূপ সময়ে আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণসম এমন কবিতা লেখার সাহস কম প্রশংসাযোগ্য হতে পারে না। পরবর্তীতে আলতাফ মাহমুদের সুরে কবিতাটি গান হয়ে ওঠে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে এই গানটির সুর বারবার আমাদের জানান দেয় একুশের মাহাত্ম্য আর বাংলা ভাষাপ্রীতির কথা।

বাঙালি জাতি হিসাবে আমাদের পরিচয় অনিবার্যভাবেই একুশে নিহিত। মায়ের মুখের ভাষা রক্ষার্থে অকাতরে জীবন বিসর্জন দেওয়ার ঘটনা ইতিহাসে বিরল। বলা যায়, এর একমাত্র দাবিদার বাঙালি। ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনেস্কোর কল্যাণে বিশ্বব্যাপী ২১শে ফেব্রুয়ারি পালিত হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশ বাঙালির জন্মের অহংকার। আর বাংলাভাষা বেঁচে থাকার অলংকার। জাতির ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যে আত্মমুক্তির যে ঋদ্ধ উচ্চারণ ধ্বনিত হয়েছিল, বুদ্ধিবৃত্তিক যে চেতনা সম্প্রসারিত হয়েছিল কাব্যচেতনায়, তা এখনো প্রবহমান।

একুশ নিয়ে পরাবাস্তবতার কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দের 'একুশে ফেব্রুয়ারি' কবিতাটি সমৃদ্ধ। কবিতাটি একটু ব্যতিক্রমও বটে।

পাড়ায় পাড়ায় নাটক- ব্রতচারী নাচ-
মুকুলের মাহফিল-কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ ফুল
আর সবুজের স্বরগ্রাম:
কলাপাতা-সবুজ, ফিরোজা, গাঢ় সবুজ, নীল,
তারই মধ্যে বছরের একটি দিনে
রাস্তায় রাস্তায় উঠে আসে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত
'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই! রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই!

আবার আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর 'মাগো ওরা বলে' কবিতায় কবি এক দুখিনী মায়ের চিত্রকল্প এঁকেছেন। '...চিঠিটা তার পকেটে ছিলো/ ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা/ মাগো, ওরা বলে/ সবার কথা কেড়ে নেবে/ তাই কি হয়?/ তাইতো আমার দেরি হচ্ছে।/ তোমার জন্য কথার ঝুড়ি নিয়ে/ তবেই না বাড়ি ফিরবো...।' ঘরে প্রতীক্ষায় কাতর মা ছেলের জন্য শখের উড়কি ধানের মুড়কি ভাজে, নারকেলের চিড়ে কোটে। একসময় কুমড়ো ফুল শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে কিন্তু খোকা ছুটি পায় না। কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এই কবিতায় অত্যন্ত কোমল হাতে, ঝাপসা চোখে ভাষা আন্দোলনে শহিদ ছেলের জন্য মায়ের প্রতীক্ষা যে কত তীব্র, কত কষ্টের তা বিবৃত করেছেন।

কবি শামসুর রাহমান 'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে' কবিতায় প্রগাঢ় মানবজীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন-

...বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে/ কত চেনা ছবি; মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া.../ নানী বিষাদ সিন্ধু স্পন্দে দুলে দুলে রমজানি সাঁঝে ভাজেন ডালের বড়া/ আর একুশের প্রথম প্রভাত ফেরি, অলৌকিক ভোর।

এছাড়া একুশের প্রেক্ষাপটে রচিত কবিতার মধ্যে পল্লিকবি জসীমউদদীনের 'একুশের গান', সুফিয়া কামালের 'এমন আশ্চর্য দিন', মাজহারুল ইসলামের 'স্বাগত ভাষা', হাসান হাফিজুর রহমানের 'অমর একুশে', কায়সুল হকের 'একুশের কবিতা', মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর 'স্মৃতির মিনার', আল মাহমুদের 'একুশের কবিতা', মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'কৃষ্ণচূড়ার মেঘ' ওমর আলীর 'বেদখল হয়ে যাচ্ছে', শহীদ কাদরীর 'একুশের স্বীকারোক্তি', ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালের 'বর্ণমালা', সৈয়দ শামসুল হকের 'একুশের কবিতা' উল্লেখযোগ্য।

'৫২ পরবর্তীতে আমাদের জাতীয় জীবনে, সামগ্রিক চেতনায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব কেবল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই পড়েনি, একুশের মহিমা বাংলা সাহিত্যেও বার বার উচ্চকিত হয়ে আসছে। মুক্তিযুদ্ধের মতোই সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় প্রেক্ষাপট হিসেবে ভাষা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কবিতার কাব্যিক চোখে, গল্পের শাব্দিক ভাঁজে, গবেষণার আগ্রহী বিষয় হিসেবে, নাটকের উদ্দীপক সংলাপ বর্ষণে বাহান্নের একুশ তারিখ এখনো প্রাণময়, চেতনাদীপ্ত; এতটুকুও পুরোনো হয়ে উঠেনি। ফলে এমন পদ্য অথবা গদ্যশিল্পী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর যিনি এ প্রেক্ষাপটে অনুরণিত হয়ে গল্প-কবিতা রচনা করেননি। তবে সব সময়ের মতোই, সব প্রেক্ষাপটের পুনঃসঞ্চায়নে ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে অন্যান্য শাখার তুলনায় কবিতাই অজর-অজস্র লেখা হয়েছে। 'একুশের প্রভাব: বাংলাদেশের কাব্যভাষার বিবর্তন' প্রবন্ধে কবিতায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে আহমেদ মাওলার মূল্যায়ন– 'একুশের পর বাঙালির যেন নতুন জন্ম ঘটে, চেতনায় ও সৃজনশীলতায় নতুন এক দিগন্তের সাক্ষাৎ পায় বাঙালি। সাহিত্যের অন্য শাখার তুলনায় কবিতাই হয়ে ওঠে বাঙালির সৃজন-বেদনার প্রিয় ক্ষেত্র। ওই দশকে, একসঙ্গে এত কবির আবির্ভাব, এত কবিতা, সম্ভবত আর কখনো লেখা হয়নি। ভাষা-আন্দোলনের অভিঘাতই বাংলাদেশের কবিতার বাঁকবদল ঘটিয়েছে, অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে বাংলাদেশের কাব্যভাষার।' সুতরাং সাহিত্যে ভাষা আন্দোলনের প্রভাবের বিষয়টি অস্বীকারও করা যাবে না। এর আগে সাহিত্যে ব্যাপকভাবে আরবি, ফারসি, ইংরেজি ভাষা ব্যবহৃত হলেও ভাষা আন্দোলন পরবর্তী বাংলা শব্দের যথাযথ প্রয়োগে কবিরা সচেতন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সফলতাও পেয়েছেন।

বাঙালির সমৃদ্ধ ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের নাম যেমন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, তেমনি বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকেও জাগ্রত রাখতে সকলের সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। আর এতেই বাঙালির প্রকৃত মুক্তি।

লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও গণমাধ্যমকর্মী

বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ে ড. আতিউর রহমানের সাক্ষাৎকার

[দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান-এর সাথে কথা বলেন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর সাবেক জিএম এম এ খালেক]

এম এ খালেক: একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নতুন করে সরকার গঠন করেছে। নতুন সরকারের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ড. আতিউর রহমান: '৯০ দশকের পর থেকে দেখেছি দেশে সরকার পরিবর্তিত হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নীতিমালা খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। বিশেষ করে ব্যক্তি খাতের প্রাধান্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহায়ক নীতিগুলো প্রত্যেক সরকারই অনুসরণ করেছে। যেটা আমরা পরিবর্তন লক্ষ করি তাহলো, কোনো কোনো সরকার অপেক্ষাকৃত বেশি গরিব-হিতৈষী হয়। যেমন, আওয়ামী লীগ সরকার বরাবরই গরিববান্ধব সরকার। তারা যখনই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করেছে তখন তারা গরিব মানুষের কল্যাণে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তবে একই সঙ্গে ব্যক্তি খাতের বড়ো উদ্যোক্তাদেরও আওয়ামী লীগ সরকার অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। রপ্তানি খাতে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের আশাতীত সুবিধা দিয়েছে। সরকার নতুন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হবার ফলে আমরা আশা করতে পারি, গত মেয়াদে সরকার যেসব মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছে, সেগুলোর বাস্তবায়ন আরো দ্রুততর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। একই সঙ্গে গরিব মানুষের কল্যাণে যেসব প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত এবং আরো নতুন নতুন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে আরো বেশি বেশি ইনক্লুসিভ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। নতুন সরকারের কাছে আমার প্রস্তাব থাকবে, যে সমস্ত মেগা প্রকল্প বেশি বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে গতি বৃদ্ধি করবে সেই প্রকল্পগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হোক। যেমন– বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কাজ। দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এগুলো তো একই সঙ্গে সম্পন্ন করা যাবে না। এক্ষেত্রে আমাদের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। এমন কিছু বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যেগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের অর্থনীতিতে বাড়তি গতি আসবে। যেমন– চট্টগ্রামের মিরেরসরাই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল যদি দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে এখানে বেশি পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও এখানে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে। ঢাকার জন্য মেট্রোরেল প্রকল্পটি খুব দ্রুত বাস্তবায়িত হওয়া উচিত। এর বাস্তবায়নের সময় জনগণ খুবই কষ্ট করছেন। তাই তাড়াতাড়ি তা সম্পন্ন হলে জনগণ স্বস্তি পাবে। তবে এখানেই থামলে চলবে না। পাশাপাশি আমাদের পাতাল রেলপথ নির্মাণের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের রাজধানী ঢাকার যে অবস্থা তাতে উপরে কাঠামো নির্মাণ করে কোনোভাবেই যানজট সমস্যার পুরোপুরি সমাধান করা যাবে না। কারণ এটা বিদ্যমান যানজট নিরসনে যথেষ্ট নয়।

এম এ খালেক: ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু বলে মনে করেন?

ড. আতিউর রহমান: ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা আমাদের জন্য একটি বিরাট সমস্যা। নতুন সরকারকে এ বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, প্রতিবছর ১৬ লাখ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। আমরা যদি এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চাই তাহলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি দিয়ে বেকার সমস্যা সমাধান করা যাবে না। এজন্য আমাদের উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তোলার প্রতি জোর দিতে হবে। উদ্যোক্তা তৈরির একমাত্র উপায় হলো ট্রেডভিত্তিক ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা কোর্স চালু করা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। যে-কোনো কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। তাই উপযুক্ত উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি করার জন্য ব্যাপক ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ইতোমধ্যেই এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায় একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছে বাংলাদেশ। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সরকার স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা 'দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' গঠন করতে পারে। সরকার এ ধরনের একটি উদ্যোগ গ্রহণের কথা ভাবছে। আশা করা যায়, চলতি মেয়াদে সরকার নিশ্চয়ই এই কাজটি সম্পন্ন করবে। প্রস্তাবিত দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের হাতে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ ফান্ড থাকা দরকার। এই ফান্ডের একটি অংশ আসবে জাতীয় বাজেট থেকে এবং অবশিষ্ট অর্থ আসবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিএসআর কর্মসূচি থেকে। প্রত্যেক সরকারি-বেসরকারি

প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে সিএসআর ফান্ড থেকে অর্থ দিতে হবে। বর্তমান সরকোর তার নির্বাচনি ইশতেহারে আগামী ৫ বছরে দেশে ১ কোটি ২৮ লাখ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির অঙ্গীকার করেছেন। এছাড়া প্রতি উপজেলা থেকে ১ হাজার জনকে বিদেশে প্রেরণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আগামীতে বেকার সমস্যা অনেকটাই কমে আসবে।

এম এ খালেক: এ বছর প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে বলে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা পূর্বাভাস দিয়েছে। আগামীতে রেমিটেন্স বৃদ্ধির জন্য সরকার কী ব্যবস্থা নিতে পারে বলে মনে করেন?

ড. আতিউর রহমান: এ বছর বাংলাদেশ যে রেমিটেন্স আহরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে তার পরিমাণ ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ রেমিটেন্স আহরণের ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১০টি দেশের মধ্যে নবম স্থানে রয়েছে। আমি মনে করি, বাংলাদেশ চেষ্টা করলেই রেমিটেন্সের পরিমাণ আরো বাড়াতে পারে। এ জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আগামী বছর আমাদের রেমিটেন্স আহরণ ১২ দশমিক ৬ শতাংশ বাড়বে বলে আন্তর্জাতিক সংস্থা মনে করছে। আমি মনে করি, আমাদের আহরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব। এ জন্য বিদেশ গমনেচ্ছুদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যদি আন স্কিলড লেবার বিদেশে না পাঠিয়ে তাদের সেমি স্কিলড করে পাঠাতে পারি তাহলে প্রবাস আয় অনেক বেড়ে যাবে। আমাদের দেশ থেকে যারা বিদেশে গমন করে তাদের বেশির ভাগই আরবি বা ইংরেজি ভাষা জানে না। ফলে তারা সঠিকভাবে বিদেশিদের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারে না। এদের সামান্য ভাষা শিখিয়ে দেওয়া সম্ভব হলে তারা আয় বাড়াতে পারে। তাদের যদি পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায় তাহলে বিদেশে গিয়ে তুলনামূলক উচ্চ বেতনে চাকরি করতে পারবে। এছাড়া জনশক্তি রপ্তানির জন্য নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হবে। জাপান আগামীতে ৩ লাখ কর্মী নেবে। আমরা যদি বাংলাদেশি ছেলেমেয়েদের কম্পিউটার এবং অন্যান্য কাজে সামান্য প্রশিক্ষণ দিতে পারতাম তাহলে জাপানে গিয়ে তারা কাজ করতে পারত। জাপানে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। সেখানে যত্ন দেবার কাজ করার মতো কর্মী দরকার। আমরা এই চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতে পারি। হোম কেয়ারিং ও ফিজিওথ্যারাপির মতো প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে যদি জনশক্তি জাপানে রফতানি করা যেত তাহলে প্রচুর অর্থ আয় করা সম্ভব। মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রফতানির প্রচুর সুযোগ এখনো রয়েছে। আমরা যদি স্থানীয় ভাষা শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছোটো ছোটো পেশাগত প্রশিক্ষণ দিয়ে জনশক্তি রপ্তানি করতে পারি তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের বাজার সহজেই দখলে রাখতে পারব। প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় করে। তার একটি বড়ো অংশ এখনো অনানুষ্ঠানিক পথে দেশে আসে। আমরা যদি এই টাকা বৈধ চ্যানেলে দেশে আনার ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহলে রেমিটেন্স আয় আরো অনেক বৃদ্ধি পেত। সরকার প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপার্জিত টাকা ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে আনার উদ্যোগ নিয়েছে। ওয়ার্ল্ড রেমিট, ব্র্যাক ব্যাংক ও বিকাশ যৌথভাবে দ্রুত প্রবাস আয় আনার উদ্যোগ নিয়েছে। অন্যান্য ব্যাংকও আমাদের মোবাইল আর্থিক সেবা গ্রহণ করে সহজেই প্রবাস আয় আনার অনুরূপ উদ্যোগ নিতে পারে। আশা করা যায়, এই উদ্যোগ সফল হলে রেমিটেন্স আহরণ অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরো দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি।

এম এ খালেক: সদ্য সমাপ্ত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারের অর্থনৈতিক সাফল্য ভোটারদের উপর কতটা প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করেন?

ড. আতিউর রহমান: আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে গত ১০ বছরে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন হয়েছে। এক দশক ধরে বাংলাদেশ টেকসইভাবে সাড়ে ৬ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বিশ্বের যে দশটি দেশ উচ্চমাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ ৭ দশমিক ৮৬ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ জাতিসঙ্ঘের রেটিং অনুযায়ী, উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করেছে। বর্তমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২৪ সালে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করবে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নানা সূচকে বাংলাদেশ অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। এতসব অর্জন সম্ভব হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের কারণেই। এ বছর আমাদের দেশে যে কৃষি উৎপাদন হয়েছে তা এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। এ বছর চালের উৎপাদন হয়েছে ৩ কোটি ৬২ লক্ষ টন। অতীতে আর কখনোই এত বিপুল পরিমাণ চাল উৎপাদিত হয়নি। এটি একটি রেকর্ড। সরকারের কৃষিবান্ধব নানা কার্যক্রমের ফলেই এমন সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। সবজি এবং মাছ উৎপাদনেও আমরা ভালো করেছি। কৃষি প্রবৃদ্ধির সুফল তো মানুষ সরাসরি পাচ্ছে। কাজেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই সুফল নিশ্চয় ভোটারদের মনে প্রভাব ফেলেছে। দেশ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে এটা সরকারের কট্টর সমালোচকগণও স্বীকার করবেন। একটি চলন্ত ট্রেন থেকে কেউ নেমে যেতে চায় না। এসব বিবেচনা করেই সাধারণ মানুষ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে।

এম এ খালেক: বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক সাফল্যের কারণ কী এবং খাতভিত্তিক সাফল্যকে কীভাবে বর্ণনা করবেন?

ড. আতিউর রহমান: বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য হচ্ছে– তারা একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের একটি বড়ো সুবিধা হলো তারা দু-টার্ম অব্যাহতভাবে ক্ষমতায় ছিল এবং আগামীতে আরো এক টার্ম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারাবাহিকতা না থাকলে এক সরকার যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা মাঝপথে আটকে যায়। এতে উন্নয়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। আমরা দেখেছি, ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার অনেকগুলো জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। কিন্তু ২০০১ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পরিবর্তন সাধিত হলে সেইসব পরিকল্পনার বেশির ভাগই মাঝপথে থেমে যায়। বর্তমান সরকার আমলে দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তা এক কথায় বিস্ময়কর। উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সঠিকভাবে তা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সময় ও খরচ বেশি লেগেছে। তা সত্ত্বেও জনগণ এর সুফল পেতে শুরু করেছে। আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন খাতভিত্তিক আলোচনা করতে পারি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে বড়ো মাপকাঠি হচ্ছে একটি দেশের জনগণের মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি পাওয়া। আমরা লক্ষ করছি, ২০০৮ সালে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় ছিল ৬৮৬ মার্কিন ডলারের মতো। দশ বছরের মাথায় এসে এটা

বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় তো এমনি এমনি বাড়েনি। এজন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হয়েছে। আমরা লক্ষ করব, শুধু বিনিয়োগ বাড়েনি একই সঙ্গে ভোগ ব্যয়ও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশে বিনিয়োগ ও ভোগ তিন গুণ বেড়েছে। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের জিডিপি'র আকার বা সাইজ ছিল ৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরে সেই জিডিপি'র আকার ২৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এটা ২৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হতে পারে। ২০২০ সাল নাগাদ আমাদের জিডিপি'র আকার ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত প্রায় এক দশক ধরে বাংলাদেশ টেকসইভাবে ৬ শতাংশের উপরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। গত তিন বছর ধরে এটা ৭ শতাংশের উপরে রয়েছে। গত অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৮৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এটা হয়ত বা ৮ শতাংশ স্পর্শ করবে। পুরো বিশ্বে যে ১০টি দেশ টেকসইভাবে উচ্চমাত্রায় প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। বিশ্বব্যাংক তাদের সর্বশেষ প্রক্ষেপণে বলেছে, আগামীতে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি কিছুটা মন্থর হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ধারায় প্রবাহিত হবে। চলতি বছর বাংলাদেশ ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। বিশ্বের ৯টি উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সবার শীর্ষে রয়েছে। বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু ব্যাপক মাত্রায় উন্নয়ন অর্জন করেছে তা নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অর্জন ঈর্ষণীয়। বিশেষ করে সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের উন্নয়ন যে-কোনো বিচারেই বিস্ময়কর। এ ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের উত্থান আমরা লক্ষ করছি। শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু ইত্যাদি সাম্প্রতিক সময়ে যেভাবে কমেছে তা পুরো উন্নয়নশীল দেশের জন্য ঈর্ষণীয়। রোহিঙ্গা সংকট সত্ত্বেও আমাদের আর্থিক স্থিতিশীলতা মজবুত। মাতৃমৃত্যু হ্রাস এবং অন্যান্য সামাজিক সূচকে উন্নয়নের কারণে আমাদের দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। কমিউনিটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। চিকিৎসা সেবা সাধারণ মানুষের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নানাভাবে উন্নতি হচ্ছে। শুধু প্রচলিত শিক্ষা নয় কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রেও জোর দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক শিক্ষা বিস্তারের হারও বেশ ভালো। সরকার এ জন্য প্রাইভেট সেক্টর, এনজিও সবাইকে কাজ করতে দিয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে ভালো উন্নতি হচ্ছে। বাংলাদেশ জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অন্য যে-কোনো দেশের তুলনায় ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে। ১৯৭২ সালে একটি দম্পতির কম করে হলেও ৫ থেকে ৬টি সন্তান থাকত। সেটা হ্রাস পেয়ে এখন ২ দশমিক ১ এ নেমে এসেছে। তার অর্থ হচ্ছে, প্রায় রিপ্লেসমেন্ট রেটের সমান হয়ে গেছে আমাদের সমাজে। এর ফলে আমাদের মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়ও বাড়ছে। মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় বাড়ছে কিন্তু মানুষ সেভাবে বাড়ছে না। এই আয়টা যেহেতু আমরা সবার মধ্যে ভাগ করে দিতে পারছি সে কারণেই ভোগের পরিমাণও বাড়ছে। মানুষের আয় এবং ভোগ বাড়ার কারণে পুষ্টি গ্রহণের মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি দারিদ্র্যের হার হ্রাসের মাধ্যমে। দারিদ্র্য এবং অতি দারিদ্র্য– দুই-ই একযোগে কমছে।

এম এ খালেক: ইতোমধ্যেই নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই অবস্থায় ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ আরো বাড়বে বলে মনে করেন কি?

ড. আতিউর রহমান: নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ব্যক্তি খাতে আরো বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যেই আমরা সে ধরনের ইঙ্গিত পাচ্ছি। ব্যবসায়ীরা বলছে, তারা ব্যবসায়ের পরিধি বাড়াবে। তারা নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে। বিডা (বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি) ইতোমধ্যেই বিনিয়োগকারীদের জন্য কার্যকর 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তারা যদি তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা সঠিক সময়ে পান তাহলে বিনিয়োগ না বাড়ার কোনো কারণ নেই। 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস'-এ আমরা এখনো অনেক পেছনে পড়ে আছি। এখানে আমাদের আরো কাজ করতে হবে। নতুন উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে সবাইকে কাজ করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকেই দায়িত্ব নিতে হবে। এছাড়া, বিচক্ষণতার সাথে আর্থিক খাত পরিচালনা করতে হবে। বাজার অর্থনীতির সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি যুক্ত করে উদ্যোক্তাবান্ধব অর্থায়ন নীতি, কৌশল পরিচালনার মূল দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংককেই নিতে হবে। পাশাপাশি, পুঁজিবাজারকেও কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগবান্ধবের উদ্যোগ নিতে হবে।

এম এ খালেক: গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমশ কৃষি নির্ভরতা কাটিয়ে উঠে শিল্পায়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

ড. আতিউর রহমান: গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমশ কৃষি নির্ভরতা কাটিয়ে শিল্পায়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে এটা খুবই আশার কথা। এই প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করার জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। খুদে ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আরো কার্যকর সমর্থন দিতে হবে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে তাদের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম তৈরি করা। মনে করুন, ১০০ জন উদ্যোক্তা আপনার কাছ থেকে ঋণ নিলেন। ১০০ জন উদ্যোক্তাই কিন্তু ফেইল করবে না। হয়ত ৮০ জন উদ্যোক্তা সফল হলো এবং ২০ জন ব্যর্থ হলো। ঐ ২০ জন উদ্যোক্তাকে প্রোটেক্ট করার জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করতে হবে। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এ ধরনের একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম তৈরির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলাম। আশা করছি, এই অভিজ্ঞতার আলোকে আগামীতে বড়ো আকারের ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করা সম্ভব হবে। সে জন্য উপযুক্ত বাজেটারি সমর্থন কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দিতে হবে। আগামীতে সেই ধরনের একটি বড়ো স্কিম চালু করা যেতে পারে। এ ধরনের একটি স্কিম চালু করা হলে অনেকেই উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। এই স্কিমের একটি অংশ নারী উদ্যোক্তাদের দেওয়া যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রারপ্রেনরশিপ ল্যাবরেটরি থাকতে পারে। সরকার একটি ফান্ড তৈরি করে এদের সাহায্য করতে পারে। এই ফান্ডে ব্যক্তি খাতের সিএসআর তহবিলও যুক্ত করা সম্ভব।

এম এ খালেক: দারিদ্র্য বিমোচনে বর্তমান সরকারের সাফল্যকে কীভাবে দেখছেন?

ড. আতিউর রহমান: ২০০৭ সালে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০ শতাংশ, বর্তমানে (২০১৭ সালে) তা ২৪.৩ শতাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৪৩.৮ শতাংশ। ২০১৭ সালে তা হয়েছে ২৬.৪ শতাংশ। অতি দারিদ্র্যের হারও দ্রুতই কমছে। ২০০৫ সালে অতি দারিদ্র্যের হার ছিল ২৫.১ শতাংশ। ২০১৭ সালে তা ১২.৯ শতাংশ হয়েছে। গত নয় বছরে গড় আয়ুও বেড়েছে। ২০০৭ সালে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ছিল ৬৪.৫ বছর। ২০১৭ সালের শেষে তা ৭২ বছরে দাঁড়িয়েছে।

এম এ খালেক: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কতটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে মনে করেন?

ড. আতিউর রহমান: এই ১০ বছরে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। গত ২০০৭-০৮ অর্থবছরে আমাদের আমদানির পরিমাণ ছিল ১,৩৩,৬৫০ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩,৪৯,১০০ কোটি টাকা। তার মানে আমদানি বেড়েছে ৩৩ গুণ। অন্যদিকে রপ্তানি ঐ সময়ের ব্যবধানে বেড়েছে পঁয়ত্রিশ গুণ। রপ্তানি ও রেমিটেন্স বাড়ায় আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এই নয় বছরে বেড়েছে পাঁচ গুণেরও বেশি। ২০১৭ শেষে তা ছিল ৩৩ বিলিয়ন ডলার। আর ২০০৭-০৮ সালে ছিল ৬ বিলিয়ন ডলারের মতো।

এম এ খালেক: অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সাফল্য কতটা বলে মনে করেন?

ড. আতিউর রহমান: বাংলাদেশ সরকার গত ১০ বছরে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অসংখ্য উদ্যোগ ছাড়াও দশটি মেগা প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই দশটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এই মেগাপ্রকল্পগুলো হলো: সেতু বিভাগের পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের– (১) পদ্মা রেল সেতু সংযোগ ও (২) দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু থেকে ঘুনদুম পর্যন্ত নির্মাণ, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের– ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (এমআরটি), নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের– (১) পায়রা বন্দর নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) ও (২) সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, বিদ্যুৎ বিভাগের– (১) মাতারবাড়ি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোলফায়ার্ড পাওয়ার ও (২) মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার (রামপাল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-এর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন। জ্বালানি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। ২০০৮ সালে ৪৫% মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ যেত। ২০১৫ সালে তা ৭৪% মানুষের ঘরে পৌঁছায়। এই দুই বছরে বিদ্যুৎ প্রাপ্তির হারও আরো বেড়ে তা ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষের ঘরে পৌঁছে গেছে।

এম এ খালেক: বর্তমান সরকার আমলে আগামীতে দেশের অর্থনীতি কেমন হতে পারে বলে মনে করেন?

ড. আতিউর রহমান: নতুন বছরের শুরুতেই আমরা একটি তারুণ্যদীপ্ত নতুন মন্ত্রিসভা পেয়েছি। আর পেয়েছি সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ অর্থনীতির এক আশা জাগানিয়া সংবাদ। সেন্টার ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চের (সিইবিআর) সর্বশেষ প্রতিবেদনে বিশ্বে বড়ো অর্থনীতির তালিকাটি কাকতালীয়ভাবে বাংলাদেশে নতুন সরকারের শপথ নেওয়ার দিনই প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার দুই ধাপ পেরিয়ে ৪১তম অবস্থানে পৌঁছে গেছে। আর ২০৩৩ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থান হবে ২৪তম। তার মানে, আগামী ১৫ বছরে ১৭টি দেশকে টপকে যাবে বাংলাদেশ। গত ১৫ বছরে টপকেছে ১২টি দেশ। আগামী পাঁচ বছরে পাঁচটি দেশকে টপকে যাবে বাংলাদেশ। তখন তার অবস্থান হবে ৩৬তম। এর পরের পাঁচ বছর আরো নয়টি দেশকে টপকে বাংলাদেশের অবস্থান হবে ২৭তম। এর পরের পাঁচ বছর অর্থাৎ ২০৩৩ সালে আরো তিনটি দেশকে টপকে বাংলাদেশের অবস্থান হবে ২৪তম। এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমাদের অর্থনীতির আকার আগামী ১৫ বছরে আড়াই গুণ বেড়ে ১.০৫ ট্রিলিয়ন ডলারে (অর্থাৎ স্থির মূল্যে ২৯ লাখ ১৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকা) উন্নীত হবে। বর্তমানে তা ২৮৬ বিলিয়ন ডলার (যা স্থির মূল্যে ১১ লাখ ৩০ হাজার ৬০০ কোটি টাকা)। এই সময়টায় আমাদের অর্থনীতি গড়ে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। আমার ধারণা, বাস্তবে প্রবৃদ্ধির হার আরো বেশি হবে। এরই মধ্যে এ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

শুধু আকারেই নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ায় এক নম্বর দেশ। আরেকটি আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন থেকে এ কথাটি জানা গেছে। ২০১৮ সালের শুরুতে প্রকাশিত আইএমএফের হিসাব মতে এ 'আইডিআই' সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৩৪তম। তার মানে, সব মিলে অর্থনীতির বাড়ন্ত কেকটির ভাগ সমাজের নিচের দিকের মানুষও পাচ্ছে। আয়বৈষম্য বাড়লেও ভোগ বৈষম্য ততটা বাড়েনি। আশা করছি, এ বছর আর কদিনের মধ্যে যে হিসাবটি বের হবে তাতে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সূচকের উন্নতিই হবে। লিঙ্গসাম্যের সূচকেও বাংলাদেশের অবস্থান এখন দক্ষিণ এশিয়ায় ১ নম্বর। বিশ্বে ৪৮তম।

গত এক দশকে সরকারের ধারাবাহিকতা, ভোগ ও বিনিয়োগের ঊর্ধ্বগতি এবং সামাজিক সংরক্ষণ সমর্থন ছাড়াও বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতের সামাজিক দায়বদ্ধ কর্মকাণ্ডের ভূমিকাও ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে আমাদের রপ্তানিমুখী শিল্পে ব্যাপক হারে নারীর কর্মসংস্থান, কৃষির ধারাবাহিক অগ্রগতি ও স্থিতিশীল মূল্যস্ফীতির কারণেও এমন অগ্রগতি অর্জন করা গেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

সিইবিআরের এ প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের এই ধারাবাহিক উন্নতির পেছনে যেসব কারণ কাজ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে, ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ ভোগের চাহিদা, সরকারি ব্যয়, প্রবাসী আয়, রপ্তানি, ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগসহ অর্থনীতির আধুনিকায়ন। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতাও ছিল উল্লেখ করার মতো। এসবের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে অর্থনীতির ওপর। রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন অনুষঙ্গ হিসেবে যুক্ত হয়েছে বিনা শুল্কে ভারতে আমাদের পণ্যের ক্রমবর্ধমান প্রবেশ। গত বছর সেপ্টেম্বর নাগাদ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসেই আমরা ভারতের কাছে ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি করেছি। এ ধারা অব্যাহত থাকলে নিশ্চয়ই বছর শেষে ভারতে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ ১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

এম এ খালেক: স্যার, আপনার মূল্যবান অভিমতের জন্য ধন্যবাদ।

ড. আতিউর রহমান: আপনাকেও ধন্যবাদ।

হৃদয়ে বাসা বাঁধা প্রেম

সুধীর কৈবর্ত

অনেকটাই দেরি করে হলেও সত্যিটাই বলছি,
সকলই হয়ে গিয়েছে কেমন ওলটপালট,
হারিয়ে বসেছি তাও– যা কিছু ছিল,
স্বপ্নেরা একে একে হারিয়েছে গতিপথ।
দুচোখ ভরে দেখা, ভালো লাগা আর মনে ধরা,
এমনি করেই তো প্রেমে পড়া,
চোখের পলকে উষ্ণ ওষ্ঠ ছুঁয়ে দেওয়া,
স্খলিত আলিঙ্গনে বুকে টেনে নেওয়া;
যা কিছু ছিল গচ্ছিত মনে, কতবার করেই না
ইনিয়েবিনিয়ে হয়ে যায় বলা।
সময় গড়িয়ে এখন শুধুই কষ্ট আর বুকভরা দুঃখ,
দেহ-মন কুঁকড়ে গিয়ে থুবড়ে আসে খোসা,
রূপ-লাবণ্যে ভরা কায়ার ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া
আপন দৃষ্টিরই সামনে দিয়ে!
আক্ষেপের অঝোর ধারায় পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
শেষ সায়াহ্নের প্রতীক্ষার প্রহর গোনা।
ফুরিয়ে আর হারিয়ে যাওয়ার শেষ পর্বে এসেও
কিছু তো রয়েই যায় অনুভব আর আস্থার–
সেই সে তারুণ্যের কাঁপনধরা,
হৃদয়ে আঁকড়ে বসা, বাসা বাঁধা প্রেম!

পারাপার

হুমায়ূন মুজিব

চিরকালের পারাপারের দেনা মিটিয়ে দিলাম
মাঝি তুমি আর অপেক্ষা করো না,
জীবনের পারাপারে
তোমার বৈঠার পাশে আছি
আশরীরী আমি।
একতারা হাতে বাউল ধরবে সুর
কিংবা কাগজে-কলমে শিল্পী আঁকবে
তোমার ক্লান্ত মুখাবয়ব।
কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায়
স্মরণের মূর্ছনা পড়বে বৃষ্টির কান্নায়,
তখন ভেবো আমি আছি
তোমার কাছে গলুইয়ের ওপর।
কান্না কেন বন্ধু-যাপিত জীবন
মুক্তি দিয়েছে আমাকে
সমস্ত দেনা-পাওনার হিসাব চুকে গেছে
এখন পারাপারে তোমার নিত্যসঙ্গী হয়ে
আড়ালে জলের শব্দ শুনব
আর তোমার ভাটিয়ালি শুনতে শুনতে
ফিরে যাব মাটির কাছে।

পাণ্ডুলিপির সরব কলস্বর

আহমদ আখতার

তেজোদীপ্ত মানুষটাকে দেখি
মানসচক্ষে সাতটা সমুদ্দুর
ছুটছে কোথায়–চপল পায়ে বুঝি
বাজছে কেবল প্রবল অশ্বখুর
আদিখ্যেতার স্বভাব নয় মোটে
নিরেট আঁধার যতই জমকালো
নিখিল জনে তোমার ভালোবাসা
অন্ধ রাতে তারার প্রদীপ জ্বালো
তেজোদীপ্ত মানুষটাকে পাই
পাণ্ডুলিপির সরব কলস্বরে
আজও যখন ষড়ঋতুর পালা
কাব্যকথায় তাকেই মনে পড়ে
বিশেষত চিত্তে যখন ভয়
হতাশ্বাসেও আকাশবাণী শুনি
সর্বোপরি মানুষ নামের গান
চির-চঞ্চল তোমারই সুরধ্বনি।

হৃদয়ে মরুভূমি

রুস্তম আলী

আমি মুগ্ধ অবাক কথা বলি–
ফুল, পাখি, ঝরনা ও নদীর সাথে।
আমার প্রেম হৃদয়ে পুষি নিভৃতে।
তোমার শরীর আজ–
অসাবধানী আঙুলের ঘষামাজা
রাঙা শাড়ির নাব্যতায়
একমুঠো শুকনো হলুদ ফুল।
নিঝুম রাতের বিষণ্নতায় মাখামাখি
অদ্ভুত বিবশ শরীর।
অনুরাগে বাঁধা পড়া মন
না হয় কাটিয়ে দিব।
বাঁধহারা সুরের দোলায়
কালো কেশের মেঘের ভেলায়।
জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার বাঁকে
আমার বুকে প্রণয় দোলা
দক্ষিণা বাও তুমি।
তোমার আঁধার প্রেমে রাঙাতে চাই
আমার হৃদয় মরুভূমি।

জীবন ভেলা

শাহনাজ

একাকী এই আমি
পথের ধূলিমা পারেনি বিবর্ণ করতে
পারেনি জীবনের স্বপ্নীল স্বপ্ন ডিঙ্গা ডোবাতে
পথ চলে ক্লান্ত হাহাকার এ জীবনে
কী পেলাম, কী হারালাম
ফিরে ফিরে দেখি তোমার ভালোলাগার বৈভব
এভাবেই বেঁচে আছি।

নারীপ্রধান পরিবার বৃদ্ধি

বিনয় দত্ত

'জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শষ্য-লক্ষ্মী নারী,
সুষম-লক্ষ্মী নারী ওই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারী'।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই কথাটি বহুলাংশে উপযুক্ত উত্তরখানের রাবেয়ার জন্য। রাবেয়া তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনাক্ষম ব্যক্তি। বছর সাতেক আগে রাবেয়ার স্বামী তালেব মিয়া সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। দেড় বছরের কন্যা কুলসুমকে সাথে নিয়ে রাবেয়ার পেছনে তাকানোর কোনো উপায় ছিল না। কারণ সকাল পেরিয়ে রাত হলেই কুলসুমের ক্ষুধা মিটাতে হবে। এইসব চিন্তা করে রাবেয়া আর বাসায় বসে থাকেনি।

শুরুতে অল্পকিছু ডিম নিয়ে রাবেয়া পাড়া-মহল্লার মধ্যে বিক্রি শুরু করে। সেই বিক্রিকৃত ডিমের লাভ থেকে কিছু টাকা সরিয়ে রাবেয়া বড়ো কিছু করার পরিকল্পনা করে। সেই জমাকৃত লাভের টাকা দিয়ে রাবেয়া একটা দোকান নেয়। সেই দোকানে বাকিতে মালামাল নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেও এখন রাবেয়া ডিমের দোকানের মালিক। মুরগি, হাঁস, কবুতরসহ কোয়েল পাখির ডিম এনে উত্তরখানে বিভিন্ন দোকানে সাপ্লাই দেয়। স্বামী মারা যাওয়ার পর রাবেয়া বাধ্য হয়ে পরিবারের হাল ধরলেও এখন রাবেয়া পরিপূর্ণ স্বাবলম্বী। গোটা পরিবার রাবেয়া একাই চালায়।

তালেব মিয়া মারা যাওয়ার পরে রাবেয়ার উপার্জনের পথে নামাটা সবাই ভালোভাবে নেয়নি। এই সময় কত কটু কথা যে তাকে শুনতে হয়েছে তার শেষ নেই। কিন্তু রাবেয়া থেমে যাইনি, এগিয়ে গিয়েছে। সবার কটু কথা শুনলে যে রাবেয়াকে না খেয়ে থাকতে হবে– এই উপলব্ধিই রাবেয়াকে ঘর থেকে বাইরে এনে স্বাবলম্বী করেছে।

শুধু রাবেয়া নয়, রাবেয়ার মতো অনেক নারীই বিভিন্ন কারণে স্বাবলম্বী হয়েছে। প্রয়োজনীয়তা রাবেয়ার মতো নারীদের স্বাবলম্বী করতে বাধ্য করেছে। নারীদের উপার্জনে চলছে গোটা পরিবার বা একজন নারীর ওপর নির্ভর করে টিকে আছে অসংখ্য মানুষ। কারণ সরকারি পর্যায়ে নারীদের স্বাধীনতার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সকল ক্ষেত্রে আমাদের নারীদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। হোটেল, সিমেন্ট কারখানা, বিউটি পার্লার, চাতাল, নিরাপত্তাকর্মী, রেস্টুরেন্ট, সিরামিকস কারখানা, ইটভাটা, নির্মাণ শ্রমিক, চা শ্রমিক, গৃহকর্মী, পোশাক খাত থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই নারীদের অর্থনীতিতে অবদান প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী, প্রতি ১০০টি পরিবারের মধ্যে ১৪টি পরিবারের প্রধান এখন নারী। জরিপের ফলাফল থেকে আরো জানা যাচ্ছে যে, অল্প বয়সি মেয়েরাই এখন পরিবারের হাল ধরছেন। এরমধ্যে ১৫ বছরের কম বয়সী নারী এখন ২১.৬ শতাংশ পরিবারের কর্ত্রী। অন্যদিকে ১৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি নারী এখন ১৩.৪ শতাংশ পরিবারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জরিপের তথ্যানুযায়ী, ৮৪.৪ শতাংশ পরিবারের প্রধান যে নারী, তিনি হয় বিধবা, নয়ত স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে। অন্যদিকে ১৪ শতাংশ পরিবারের প্রধান অবিবাহিত নারী। যেসব নারী পরিবারের হাল ধরেছেন, তাঁদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি চট্টগ্রাম বিভাগে। বিভাগটিতে নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা ২১.৫ শতাংশ। তার পরেই রয়েছে সিলেট বিভাগ।

তথ্যানুযায়ী, ২০১৩ সাল থেকে নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৬ সালে যেখানে নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা ছিল প্রতি ১০০-তে ১১.৬টি, ২০১৪ সালে এ হার ছিল ১২.২টি এবং ২০১৫ সালে ছিল ১২.৭টি, ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮.৮টিতে।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান মোহসিনা হোসাইন মনে করেন, 'আগে নারীদের শুধু ঘর গৃহস্থালির কাজে নিয়মিত দেখা যেত, এই প্রেক্ষাপট এখন পরিবর্তিত হয়েছে। এখন একজন নারী যেমন বাইরে পুরুষের সমকক্ষীয় হয়ে শ্রম দিচ্ছেন তেমনি পুরো পরিবার একহাতে সামলে নিচ্ছেন। এটি পরিবারে নারী ক্ষমতায়নের একটি বড়ো অগ্রযাত্রা।'

বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে দেশের এক কোটির বেশি মানুষ মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছেন। যাদের পরিবার সামলে নিচ্ছেন পরিবারের নারী সদস্য। সেই হিসেবেও নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। আরেকটা বিষয় হলো, সরকারের নারী ক্ষমতায়নে উৎসাহের কারণে গোটা দেশের নারীদের ক্ষমতায়ন হচ্ছে, বিশেষ করে পোশাক খাতে। সেক্ষেত্রেও তারা পরিবারের দায়িত্ব নিচ্ছেন। এছাড়া পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি বাঁচেন এই বিষয়টিও একটি কারণ হতে পারে। যার কারণে দেশে নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে।

নারীপ্রধান পরিবার বা পরিবারের প্রধান কর্মক্ষম ব্যক্তি হিসেবে নারীর অবস্থান তৈরি করা সহজ ছিল না। অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারীরা আজকের এই অবস্থানে এসেছে। শুধু নারীপ্রধান পরিবারই নয়, নারীর একক সাফল্যে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানও তৈরি হচ্ছে বর্তমানে।

নারীরা পরিবারের প্রধান হবেন বিষয়টি এখনো সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয়। তাই অনেক নারী পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রী হিসেবে পরিচিতি পেতে চান না। ফলে নারী পরিচালিত পরিবারের সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে বলে মনে করেন কয়েকজন নারীকর্মী। শুধু নারীর পরিবারে প্রধান উপার্জনাক্ষম হওয়াই নয় দেশের বড়ো শিল্প খাতও এখন নারীর ওপর নির্ভর করে আছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার দ্বিতীয় বৃহৎ খাত হলো পোশাক শিল্প। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের ৮০ শতাংশের বেশি নারী। একরকম বলা চলে, নারী শ্রমিকদের ওপরই চলে এই পোশাক খাত।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, স্পিকার, বিভিন্ন পদে নিযুক্ত মন্ত্রী নারী। তৃণমূল পর্যায়েও নারীর ক্ষমতায়ন এখন বিস্মিত হওয়ার মতো। নারী শিক্ষার প্রসার, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ, একই সাথে নারীর নতুন কর্মক্ষেত্র নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করছে। দেশের প্রতিটি খাতে এখন নারীদের সফল পদচারণা। শিক্ষিত নারীদের পাশাপাশি অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত নারীরাও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কারণে নারী ক্ষমতায়ন বা নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সমাজে এর প্রতিফলন ঘটতে শুরু করেছে দ্রুততার সাথে। এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে, এটিই আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

নিবন্ধ

দুর্যোগে তথ্য জানা ও বোঝার প্রযুক্তি

মো. শাহেদুল ইসলাম

বজ্রপাত শব্দের ল্যাটিন রূপ হচ্ছে টোনার। আর টোনার শব্দটির স্প্যানিশ রূপ ত্রোনাদা যার মানে বজ্রগর্ভ ঝড়। অতঃপর ইংরেজি রূপ টর্নেডো। কয়েক বছরে সিডর, আইলা শব্দটি পরিচিত হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছরই ঘূর্ণিঝড় হওয়ার আশঙ্কা থাকে। উত্তরে হিমালয় এবং সমুদ্র উপকূল ফানেল বা চোঙাকৃতি হওয়ার জন্য এদেশ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পতিত হয়।

বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, নদীভাঙন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের মানুষের নিত্যসহচর। গত শত বছরে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য ঘূর্ণিঝড়। প্রতিবছর এপ্রিল- মে মাসে টর্নেডোর প্রকোপ দেখা যায়। বাংলাদেশে এটি ঘূর্ণিঝড় বা কালবৈশাখি নামে বহুল পরিচিত। সাধারণত টর্নেডো প্রচণ্ড গতিতে ঘুরতে থাকা বাতাসকে বুঝানো হয়ে থাকে। তবে এই প্রচণ্ড গতিতে ঘূর্ণায়মান বাতাসকে টর্নেডো হতে গেলে তাকে অবশ্যই ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে। টর্নেডোর আকার-আকৃতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একে ফানেলের আকৃতিতে দেখা যায়। বেশিরভাগ টর্নেডোয় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১১০ মাইলের কম থাকে। সাধারণ কয়েক মাইল যাওয়ার পরই এসব টর্নেডোর শক্তির হ্রাস হয়। কিন্তু একটি শক্তিশালী টর্নেডোতে বাতাসের গতিবেগ ৩০০ মাইল হতে পারে। এই ধরনের শক্তিশালী টর্নেডো ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকাজুড়ে তাণ্ডব চালায়। সবসময়ই টর্নেডো একদিকে ঘোরে অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাটার বিপরীতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাটার দিকে ঘোরে। টর্নেডোর ধ্বংস ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১৯৭১ সালে জাপানি ও আমেরিকা বিজ্ঞানী এ স্কেল উদ্ভাবন করেন। তাঁর নামের সঙ্গে মিল রেখে এ স্কেলের নাম রাখা হয় ফুজিতা স্কেল। ফুজিতা স্কেলের উন্নত সংস্করণটি বর্ধিত ফুজিতা স্কেল নামে পরিচিত। এ স্কেল অনুসারে যেসব টর্নেডো শুধু গাছপালা ধ্বংস করে এগুলো ইএফও টর্নেডো। আর দালানকোঠা উপড়ে ফেলতে সক্ষম হলে তা ইএফও জাতীয় টর্নেডো। যখন শীতল আর শুকনো বাতাসের সাথে সিক্ত আর উত্তপ্ত বাতাসের সংঘর্ষ বাঁধে তখন এমন এক মারাত্মক ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হয়, যাকে বলে মেসোসাইক্লোন। পরিবেশ অনুকূলে এল মেসোসাইক্লোনের নিচে জমা হতে থাকে ওয়াল ক্লাউড নামের মেঘ। আর এই ওয়াল ক্লাউডের নিচেই ব্যাপক গতি ও ক্ষমতা নিয়ে ফুঁসতে থাকে টর্নেডোর ঘূর্ণিপাক। অনেক সময় লক্ষ করা যায় একটি মাত্র টর্নেডো থেকে অনেকগুলো টর্নেডোর সৃষ্টি হয়। কিংবা পুরোনো ঝড়টি নতুন ঝড়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে তাকে আরো শক্তিশালী করে তুলছে। এ ধরনের টর্নেডোকে বলে টর্নেডো পরিবার। আবার কখনো টর্নেডো সৃষ্টি হতে থাকে তাকে বলে টর্নেডো মরক। টর্নেডোর আকার বা স্থায়িত্ব দিয়ে এক ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। অধিক জায়গা নিয়েও টর্নেডো কম ক্ষতিকর হতে পারে, বিপরীতে অল্প জায়গা নিয়েও হতে পারে মারাত্মক, ভয়ংকর ইতিহাস উত্তীর্ণ। আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তা আয়েশা খাতুন জানান, আবহাওয়ার অনেক কিছুর মতো টর্নেডো এখনো ভালো করে বুঝে ওঠতে পারেনি বিজ্ঞানীরা। সুনামি, ভূমিকম্পেরও আগাম সংকেত দেওয়া যায় না। শক্তিশালী রাডার টর্নেডো ধরতে পারলেও প্রচার করতে করতেই তো টর্নেডো হামলে পড়ে। এখন টর্নেডোর ক্ষয়ক্ষতি মাপা হয় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত হলো তা দেখে। স্থানীয়ভাবে এত অল্পসময়ে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে যে, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। কেবল ঘটে যাওয়ার পরই জানা যায়। তবে পালস-ডপলার নামে একটি রাডারের সাহায্যে টর্নেডোর পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। ঝড় পূর্বাভাস কেন্দ্রের আবহাওয়াবিদ এসএম কামরুল হাসান বলেন, প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী টর্নেডোটি ঊর্ধ্বাকাশের ১৫-২০ কিলোমিটার ওপর থেকে নিচে নেমে আসে। টর্নেডো যখন ভূমিতে আঘাত করে তখন তা চোখের পলকে একের পর এক জনপদ ধ্বংস করে দেয়।

বাংলাদেশে স্পারসো (বাংলাদেশ স্পেস রিসার্চ অ্যান্ড রিমোট সেনসিং অরগানাইজেশন) আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এসব তথ্য সংগ্রহ করে। স্পারসোর এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়েছে, ১৮৯১ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে মোট ১৭৪টি বড়ো ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। ১৯৮০ সালের আগে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় শনাক্তকরণের যন্ত্র বা প্রতিষ্ঠান ছিল না। সে বছরই প্রথম স্পারসো গঠন করা হয়। তারপর থেকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যত ঘূর্ণিঝড় গেল সবগুলো স্পারসো পর্যবেক্ষণ করেছে। দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ (স্যাটেলাইট) ব্যবহার করে স্পারসো। কৃত্রিম উপগ্রহদ্বয়ের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম তথ্য পাওয়া যায়। তারমধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নোয়া, যাতে দুই ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে জিওস্টেশনারী (মহাকাশে স্থির অবস্থায় থাকে) ও পোলার অরবিটিং (ঘূর্ণায়মান) কৃত্রিম উপগ্রহ। জিওস্টেশনারী কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী থেকে ২২ হাজার ২৪০ মাইল এবং পোলার অরবিটিং স্যাটেলাইট ৫৪০ মাইল দূরে অবস্থান করে। নোয়া স্যাটেলাইট থেকে স্পারসো প্রতিদিন দুটি করে স্যাটেলাইট ছবি পায়। অপর স্যাটেলাইটটি হচ্ছে এফওয়াইটুসি– আবহাওয়া বিষয়ক কৃত্রিম উপগ্রহ। এই দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহারের ফলে ৮ থেকে ১০ মাইল দূরের ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। স্পারসো ১২ই নভেম্বর ২০০৭ সাল থেকেই সিডরের ওপর নজর রেখেছিল। প্রতি ঘণ্টায় সিডরের অবস্থান ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়। আগে থেকেই প্রস্তুতি থাকার ফলে অন্যবারের ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. ওবায়দুল কাদের বলেন, বর্তমানে স্পারসো যে দুটি স্যাটেলাইট ব্যবহার করছে তা দিয়ে অনেক আগে থেকে যে-কোনো ঘূর্ণিঝড় শনাক্ত করা যাবে। তাছাড়া নোয়ার মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও তথ্য জানা যায়। তবে এক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আকাশ মেঘলা থাকলে নোয়া ছবি তৈরি করতে অক্ষম। কারণ এ ধরনের স্যাটেলাইট অনেকটা ক্যামেরার মতো কাজ করে থাকে। আলোর প্রতিফলনকে কাজে লাগিয়ে ছবি তৈরি করে, এজন্য সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়। এ সমস্যার সমাধান করা যায় যদি মাইক্রোওয়েভ স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হয়। স্পারসোতে এ ধরনের কোনো স্যাটেলাইট নেই। এ ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ স্টেশন ব্যবহারের জন্য পৃথক করে ভূমিতে অবস্থিত স্টেশনের প্রয়োজন পড়ে। বাংলাদেশে এমন স্যাটেলাইটের একটি গ্রাউন্ড স্টেশন বসানো হলে ঘূর্ণিঝড়, বন্যাসহ যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের তথ্য আরো সঠিকভাবে জানা যাবে বলে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এ বিষয়ে আরো বাস্তবসম্মত ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

লেখক: প্রাবন্ধিক

সৈয়দ জাহাঙ্গীরের মহাপ্রয়াণ

সুহৃদ সরকার

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বরেণ্য চিত্রশিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর বাংলাদেশে চিত্রশিল্পের এক অনন্য প্রতিভা। সার্বক্ষণিকভাবে

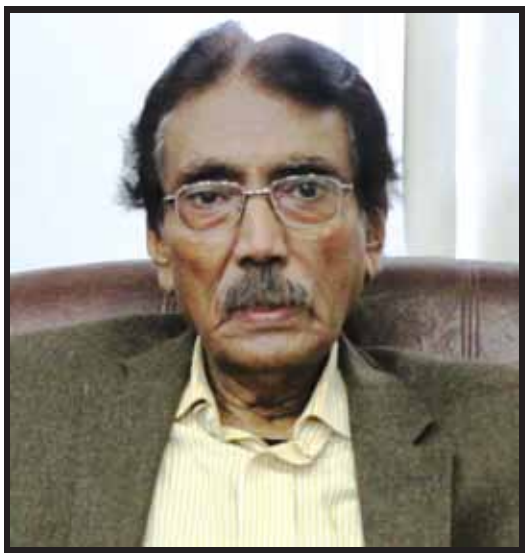

নিজেকে চিত্রশিল্পে নিয়োজিত রেখে নিজেকে নিয়ে গেছেন এক গর্বিত উচ্চতায়। বরেণ্য চিত্রশিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর ২০১৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বেলা ১১টায় রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোডে নিজস্ব বাসভবনে সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। চলে গেছেন তবে রেখে গেছেন তাঁর সৃষ্টির এক বিশাল ভাণ্ডার, যা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে অগণিত ভক্ত এবং গুণগ্রাহীদের অন্তরে।

চিত্রশিল্পী সৈয়দ জাহাঙ্গীর ১৯৩৫ সালের ২রা জানুয়ারি সাতক্ষীরা জেলার তালা থানার তেঁতুলিয়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী হাসেমী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মঈনউদ্দিন হাসেমী এবং মায়ের নাম জাহেদা বেগম। তাঁর পিতার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র প্রখ্যাত কবি, নাট্যকার ও সমকাল খ্যাত সিকান্দার আবু জাফর এবং মেজো পুত্র সৈয়দ কোহিনুর আকবর ছিলেন একজন প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়ার।

তালা থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং বড়ো ভাই সিকান্দার আবু জাফরের অণুপ্রেরণায় সৈয়দ জাহাঙ্গীর ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে পাস করে ১৯৫৫ সালে। পাকিস্তান আমলে লোভনীয় সরকারি চাকরির অফার পাওয়া সত্ত্বেও একমাত্র ছবি আঁকার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে শিল্প সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ১৯৭৭ সালে তিনি শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে যোগ দেন এবং শিল্পকলা একাডেমিতে চারুকলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনিই দ্বিবার্ষিক এশীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীর প্রবর্তন করেন।

সৈয়দ জাহাঙ্গীর জীবনের রিয়ালিস্টিক কর্মে ছবি এঁকেছেন। চেয়েছেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের বোধকে নিজের বোধের সাথে মিলাতে। এই বোধ থেকে গত দশ বছরে ছবি আঁকার বিমূর্ত ফর্ম থেকে সরে এসে দাঁড়িয়েছেন সাধারণ মানুষের পাশে। গ্রামীণ জীবন ও আকাশের নীল আর নীলের সাথে মিশে গেছে মাটি আর পাকা ধানি রং। ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে গাঢ় হলুদ আর ইয়োলো ওকার। দীর্ঘদিনের নিবিষ্ট চর্চা থেকে তিনি তাঁর এই পরিপক্কতা তাঁকে নিয়ে গেছে নানামাত্রিক উচ্চতায়।

সৈয়দ জাহাঙ্গীর ১৯৫৮ সালে আমেরিকান ফোর্ড ফেলোশিপের আওতায় আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রে গিয়ে আমেরিকান আর্টের বিভিন্ন ধারার সাথে পরিচিত হন। এই সময়ে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান আর্টের ওপর বক্তৃতা দেন। বিশেষ করে তাঁর সময়কালীন শিল্পী জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, মুর্তজা বশীর, দেবনাথ চক্রবর্তী, রশীদ চৌধুরী, রাজ্জাকসহ অনেকের ছবির জগৎ এবং কাজের ধরন নিয়ে বক্তৃতা দেন। আমেরিকায় থাকতে ওয়াশিংটন ডিসি ও ফিলাডেনফিয়াতে সৈয়দ জাহাঙ্গীরের একক চিত্র প্রদর্শনী হয়। ১৯৯৭ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর সার্বক্ষণিকভাবে শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তিনি ইউরোপ ও প্যারিসের শিল্পজগৎ ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। তাঁর একক প্রদর্শনী হয়েছে ৪২টি। এছাড়া আরো কিছু যৌথ প্রদর্শনী হয়েছে তাঁর।

সৈয়দ জাহাঙ্গীরের ৮২তম একক প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া চিত্রকর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাঁর চিত্রকর্মের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে। যেমন– 'বালু ও নৌকা', 'নবান্ন', 'মাটিকাটা', 'সুখনীড়', 'ভূমিদস্যুদের বর্বরতা', 'পথচলা', 'শাপলা', 'ফেরিঘাট', 'স্বাধীনতা উৎযাপন', 'পরিবেশ', 'নারী শ্রমিক', 'ঘরে ফেরা', 'নদীদখল', 'চাঁদনী রাতে জোয়ার', 'আত্মরক্ষার্থে রোহিঙ্গা' ইত্যাদি।

সৈয়দ জাহাঙ্গীর অঙ্কিত ম্যুরাল দেশের বিভিন্ন স্থানে আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ম্যুরালগুলো হলো–১৯৮৮ সালে জনতাব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে সিরামিক টাইলস এর তৈরি 'চিরন্তন বাংলাদেশ', ১৯৯৬ সালে ভাষা 'আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ' বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনায় ইত্যাদি। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পেয়েছেন একুশে পদক, চারুশিল্পী সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত সম্মাননা, মধুসূদন একাডেমি পুরস্কার, শশীভূষণ সম্মাননা, বাজার পেইন্ট আজীবন সম্মাননা, হামিদুর রহমান পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা।

শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ ব্যাংক, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ বিমান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় সৈয়দ জাহাঙ্গীরের চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে। তিনি নেই তবে রেখে গেছেন তাঁর অবিস্মণীয় শিল্প সম্ভার।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

অসমীয়া ভাষায় বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী

কে সি বি তপু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* এবার প্রকাশিত হলো অসমীয়া ভাষায়। ২৫শে ডিসেম্বর ২০১৮ ভারতের আসাম রাজ্যের ৩২তম গৌহাটি গ্রন্থমেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে অসমীয়া সংস্করণের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থটির মোড়ক যৌথভাবে উন্মোচন করেন মেঘালয়ের গভর্নর তথাগত রায়, ভারতে বাংলাদেশের উপহাইকমিশনার রকিবুল হক ও আসাম সাহিত্য সভার সভাপতি ড. পরমানন্দ রাজবংশী।

অসমীয়া ভাষায় অনূদিত বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়–ছবি: বাসস

ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গভর্নর তথাগত রায় তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর কষ্ট-ত্যাগের কথা বর্ণনা করেন। ১৯৫০-এর দশক থেকে ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত এই উপমহাদেশের সত্যিকারের ইতিহাস অনুসন্ধানে বঙ্গবন্ধুর ওই গ্রন্থটি সহায়ক হবে বলেও তিনি জানান। আসাম সাহিত্য সভার সভাপতি ড. পরমানন্দ রাজবংশী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চমকপ্রদ নেতৃত্বে বাংলাদেশের অসাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির জোরালো প্রশংসা করেন।

ভারতে বাংলাদেশের উপহাইকমিশনার রকিবুল হক বলেন, অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত এই গ্রন্থ বাংলাদেশ ও আসামের জনগণের শক্তিশালী সম্পর্কের নিদর্শন হিসেবে গণ্য হবে। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থটির অসমীয়া ভাষায় অনুবাদক বিখ্যাত বাঙালি লেখক সৌমেন ভারতীয়া ও ড. জুরি শর্মা বলেন, বাংলাদেশের জন্মকে ঘিরে উপমহাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁরা ধারণা পেয়েছেন ঐ গ্রন্থ থেকে। বাংলাদেশ সরকার ও ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশের বিশেষ সহায়তায় অসমীয়া সংস্করণ প্রকাশ করেছে ভারতের আসাম রাজ্যের গৌহাটির ভিকি পাবলিকেশন্স। ভারতে বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার ড. শাহ মোহাম্মদ তানভীর মনসুর গ্রন্থটি প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ, বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনের প্রায় ১৪ বছর কাটিয়েছিলেন কারাবাসে। তিনি এই কারাবাসে থাকাকালীন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অনুরোধে তাঁরই গুছিয়ে দেওয়া খাতায় লিখেছেন নিজের জীবনের সময়ের কথা, তুলে ধরেছেন সেই সময়ের রাজনীতি ও আবহমান বাংলার কথা। বঙ্গবন্ধুর সেই লেখা নিয়ে ২০১২ সালের জুন মাসে ঢাকার ইউপিএল থেকে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* প্রকাশিত হয়।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। তবে এ গ্রন্থটি শুধু একটি আত্মজৈবনিক গ্রন্থ হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে ১৯৩৯ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশের বিশেষত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের অনবদ্য, নিরপেক্ষ ও নির্মোহ দলিল। তাই তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি আকরগ্রন্থ। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র আবেদন বহুমাত্রিক। টুঙ্গিপাড়ার খোকার বাংলার প্রতিনিধি হয়ে ওঠার অন্তরঙ্গ গল্প। একজন হৃদয়বান নেতার দেশের সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলোকে গভীরভাবে অনুধাবন করে সেসব সমাধানের সংগ্রামের অসাধারণ আখ্যান এ গ্রন্থটি। এতে প্রকাশ পেয়েছে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের সহজ, সুন্দর ও সাবলীল ভাষ্য। এর ভাষারীতি মূলত বঙ্গবন্ধুর মুখের ভাষার কাছাকাছি। অসাধারণ চড়াই-উতরাইয়ে ভরা লেখকের জীবনের গল্প, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে অমূল্য তথ্য।

বহুল আলোচিত এ গ্রন্থটি হিন্দি, ইংরেজি, চীনা, জাপানি, ফরাসি, আরবি, তুর্কি ও স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশের পর অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হওয়ায় নতুন আরেকটি মাইলফলক অতিক্রম করল। অন্যান্য ভাষায় অনূদিত সংস্করণের ন্যায় অসমীয়া সংস্করণের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র বহুল প্রচার কাম্য।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

ভালো আছি বেশ

তাহমিনা বেগম

৮ই ফাল্গুন তুমি কৃষ্ণচূড়ায় আগুন
তোমার আভায় ঝলসাই হৃদয়ে হয় ক্ষরণ
তুমি কত বুলেটবিদ্ধ লাশের বদলা
ফিরিয়ে এনেছ দেশমাতৃকার নিজের ভাষায় কথা বলা।
বিশ্বের কোথাও হয়নি ভাষার জন্য এমন মরণ
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়ে তাইতো আমার ভাষাকে করেছে বরণ।
মাগো তোমার সন্তানেরা পারে দিতে অকাতরে প্রাণ
তাইতো তারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে রেখেছে ভাষার মান।
অ, আ, ক, খ এত মধুর ধ্বনি
খুঁজে পাবে না কেউ এমন জন্মভূমি
মাগো আজ যাদের প্রাণের বিনিময়ে আমাদের এই অর্জন
পাকিদের মুখে তাদের জন্য করি গর্জন।
দেখ দেখ হায়েনা পেরেছিস কি দমাতে
বাংলার কৃষক থেকে বুদ্ধিজীবী জেলেকে ?
ওরে মিষ্টি মোদের ভাষা
তোকে নিয়েই আমাদের সব আশা
এগিয়েছে মা, দেশ
এই সুখেই ভালো আছি বেশ।

ফুলের ফাগুন

জাকির হোসেন চৌধুরী

ফাগুন মাসের কৃষ্ণচূড়ার ফুলের লালে
আমার বুকে কাঁটা বিঁধে আশার পালে
ভাষার আশায় ছুটে চলি মায়ের পাশে
জড়িয়ে রাখো মাগো তোমার সবুজ ঘাসে
আমি আছি ভয় পেয়ো না, রুখব ওদের
কণ্ঠ চেপে রাখতে পারে সাহস কাদের
বাংলা ভাষা থাকবে সোনা সবার মুখে
স্নেহ-মায়ায় থাকবে সবাই আমার বুকে
বাংলা ভাষা উঠল জেগে মায়ের কথায়
সাহস নিয়ে যায় এগিয়ে ভয় ছিল না
বর্গীরা সব পালিয়ে গেল আসন ছেড়ে
বাংলা ভাষা ফিরে পেল ফুলের ফাগুন
একুশ এলে প্রভাতফেরির ফুলের মেলা
যায় থেমে যায় মিছিল দেখে সকল খেলা
ওদের জন্য গাঁথা মালার ফুল ছিল লাল
শহিদ যারা হয়েছিল সেই মিছিলে
তাদের গলায় দিই পরিয়ে চিরটা কাল।

স্বপ্নলোকের চাবি

ওয়াসীম হক

ইচ্ছেমতন বলব কথা
মায়ের মধুর ভাষায়,
কিন্তু হঠাৎ শত্তুরেরা
চোখ রাঙিয়ে শাসায়।
বাঙালিদের বুকের ভেতর
ঝলসে ওঠে আগুন,
সোনার ছেলে জীবন দিল
তারিখ আটই ফাগুন।
বুকের তাজা রক্ত দামে
পূরণ হলো দাবি,
আমরা পেলাম বাংলা ভাষার
স্বপ্নলোকের চাবি।

পানুবিবি আজও কাঁদে

মিয়াজান কবীর

বাংলার ছায়াপল্লি গ্রাম
নওয়াধা পারিল তার নাম।
এই গ্রামের ছেলে রফিক
ধলেশ্বরীর জলের ধারায় বেড়ে ওঠে
পঁচিশ বসন্তের যৌবনদীপ্ত যুবক
দেখে ঘর বাঁধার স্বপ্ন
ষোড়শী কন্যা পানুবিবির সঙ্গে।
'পানচিনি' আনুষ্ঠানিকতায় ধার্য হয় বিয়ের দিন-ক্ষণ,
শুধু বাকি ছিল কলেমা ও কাবিনের।
বিয়ের সওদা করতে ঢাকায় আসে রফিক
দেখতে পায় ভাষা আন্দোলনের উন্মাতাল ঢেউ,
রফিকের চোখে ভেসে ওঠে বর্ণমালার রূপ।
মাতৃভাষার দাবিতে একুশের মিছিলে
একাকার হয়ে যায় রফিক।
মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে 'রাষ্ট্রভাষা–বাংলা চাই'
স্লোগানে-স্লোগানে কাঁপিয়ে তোলে রাজপথ।
পুলিশ গুলি ছোড়ে মিছিলে
গুলির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় রফিকের মাথার খুলি।
বকুল ফুলের মতো ঝরে পড়ে রফিকের মাথার মগজগুলো,
রক্তাক্ত হয় ঢাকার রাজপথ
লাল রক্তে রঞ্জিত হয় বর্ণমালা।
বাড়ি ফেরা আর হয়নি রফিকের
কেনা হয়নি বাগদত্তার জন্য ঢাকাই শাড়ি,
কানের দুল, রঙিন ফিতে।
বিয়ের পিঁড়িতে বসা হয়নি তাঁর
হাতে লাগেনি মেহেদির ছোঁয়া।
একুশ এলে রফিকের রক্তে রাঙা হয়ে
ফোটে শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়া;
শিমুল পলাশের লাল রঙ দেখে
কাঁদে রফিকের বাগদত্তা বধূ পানুবিবি।
বিরহীনির কান্না শুনে
শুকশারির চোখ ফেটে ঝরে কান্না
তোলে বুকফাটা আর্তনাদ
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল...।

থেমে গেল ইমতিয়াজ বুলবুলের সুরের মূর্ছনা

মো. সালাহউদ্দীন

বরেণ্য সুরকার, গীতিকার, সংগীত পরিচালক ও মুক্তিযোদ্ধা আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল সুরের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন পরপারে। ২২শে জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারি তাঁর জন্ম। একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি রাইফেল হাতে যুদ্ধ করেছেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর। ঢাকার আজিমপুর ওয়েস্টেন্ট হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। ২৫শে মার্চ রাতের গণহত্যা দেখার পর প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেন বুলবুল ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু। ছোটো একটি মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করে জিঞ্জিরায় ঘাঁটি তৈরি করেন। সেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে টিকতে না পেরে ঢাকায় আসেন এই মুক্তিযোদ্ধা। জানতে পারেন বড়ো ভাই ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ টুলটুল মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা দলে যোগ দিয়েছেন। বড়ো ভাইয়ের কাছ থেকে গ্রেনেড নিয়ে জুলাই মাসের মাঝামাঝি নিউমার্কেটের ১ নম্বর গেটে পাকিস্তানি বাহিনীর লরিতে আক্রমণ করেন। আগস্টে ভারতের মেঘালয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে ঢাকার লালবাগ এলাকায় কাজ শুরু করেন। অক্টোবরে আবার ভারতে যাওয়ার সময় কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাঝামাঝি তন্তর চেকপোস্টে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে ধরা পড়েন। নির্মম নির্যাতনের পর বন্দি করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারাগারে। সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাকে পুনরায় পাকবাহিনী ধরে নির্যাতন করে এবং রমনা কারাগারে বন্দি করে। যুদ্ধকালীন তিনি কারাগারেই ছিলেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের গান তৈরিতে মনোনিবেশ করেন দেশপ্রেমিক এই গুণী। টানা ৮ বছর শুধু দেশের গান করেছেন। ১৯৭৮ সালে 'মেঘ বিজলী বাদল' ছবিতে সংগীত পরিচালনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করেছেন। দু' বার পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। এছাড়া সংগীতে অবদানের জন্য রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মাননা একুশে পদক, 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কার' সহ অন্যান্য পুরস্কার পান।

আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল-এর জনপ্রিয় কিছু গান হলো:

* সব কটা জানালা খুলে দাও না
* আমার সারাদেহ খেয়োগো মাটি
* মাঝি নাও ছাইড়া দে ও মাঝি পাল উড়াইয়া দে
* সেই রেল লাইনের ধারে
* সুন্দর সুবর্ণ তারুণ্য লাবণ্য
* ও আমার আট কোটি ফুল দেখ গো মালি
* একতারা লাগে না আমার দোতারাও লাগে না
* মাগো আর তোমাকে ঘুম পাড়ানি মাসি হতে দেব না
* আমার বুকের মধ্যেখানে
* আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন
* তোমায় দেখলে মনে হয়, হাজার বছর আগেও বুঝি ছিল পরিচয়
* আমি তোমারি প্রেমও ভিখারি
* ও আমার মন কান্দে, ও আমার প্রাণ কান্দে
* আইলো দারুণ ফাগুনরে
* আমি তোমার দুটি চোখে দুটি তারা হয়ে থাকবো
* পৃথিবীর যত সুখ আমি তোমারই ছোঁয়াতে যেন খুঁজে পেয়েছি
* কত মানুষ ভবের বাজারে, তুই ছাড়া কে আছে আমার জগৎ সংসারে
* বাজারে যাচাই করে দেখিনি তো দাম
* আম্মাজান আম্মাজান
* আমার একদিকে পৃথিবী একদিকে ভালোবাসা
* স্বামী আর স্ত্রী বানাইছে যে জন মিস্ত্রি
* আমার জানের জান আমার আব্বাজান
* আমার গরুর গাড়িতে বৌ সাজিয়ে
* ঈশ্বর আল্লাহ বিধাতা জানে
* এই বুকে বইছে যমুনা
* অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার মন
* সাগরের মতোই গভীর, আকাশের মতোই অসীম
* প্রেম কখনো মধুর, কখনো সে বেদনাবিধুর
* আমার সুখেরও কলসি ভাইঙ্গা গেছে লাগবে না আর জোড়া
* পৃথিবী জন্ম যেদিন থেকে, তোমার আমার প্রেম সেদিন থেকে।

তাঁর বেশির ভাগ দেশাত্ববোধক গানের শিল্পী ছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন। আরো ছিলেন– রুনা লায়লা, সৈয়দ আব্দুল হাদি, এন্ড্রু কিশোর সহ সমকালীন সব বিখ্যাত শিল্পী। তিনি নিজেকে ফলাও করেননি কখনো। শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। যুদ্ধাপরাধ মামলায় সাক্ষী দেওয়ায় মৃত্যুর আগের কয়েক বছর তিনি গৃহবন্দি অবস্থায় কাটিছেন। দেশবরেণ্য এই শিল্পীকে আমরা ভুলব না কোনোদিন। তাঁর গানের মাঝে তিনি বেঁচে থাকবেন। আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল রচিত ও সুরারোপিত অসংখ্য গান চিরকাল মানুষকে প্রশান্তি দেবে। আল্লাহ তাঁকে বেহেশত নসিব করুন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

মা কোথায়

সৈয়দ শাহরিয়ার

মা কোথায়
বুকের ভেতর,
বাইরে যা দেখি
দেহ যেন ভিন্ন
তার যত মেঘ
মনের ভেতর,
জমে থাকে
নুনের আকর,
অপাপ তাহার
শিশির ধারণ দৃষ্টি
মা কতটা মায়ের আড়াল,
দুঃখ গহিন রাত্রির!

চাবি

শাহরিয়ার নূরী

কার সে শক্তি দুয়ার রুদ্ধ রাখে
তালা মিস্ত্রি বলে চলে নিজ মনে
রোহাঙ প্রাণের বাধা না মানা দাবির
টান, খুলে দিতে হয় দোর
জনমের মতো কোন্ তালা বন্ধ থাকে?
পরাণ পাখির গান
ফকির লালন জানতেন,
চাবির সন্ধান
বুকের ভেতর কষ্ট না আঁধার–
মানুষ কাহার!
খুলে গেলে সুখে ফেরা
ঝোলানো চাবির সারি গোলবৃত্তে
হাতে বাজে একগোছা আর্তনাদ
সে হাঁক দেয় না চাবির গোমর ভাঁজে!

একটি কড়ি পথের

সাদিয়া সুলতানা

এক দুনিয়া আগুন জ্বেলে
একটু দুঃখ দিলাম
দীর্ঘশ্বাস ওঠে? হয়ত জমাট ভাঙে
আর কী দেবার আছে
জমছে দেখো চোখের কোনায়
বিস্তীর্ণ সবুজ দলে
শিশির নীরব কষ্ট।
পদপ্রান্তে বেলা নামে-খেয়াঘাট পাব?
একটি কড়ি পথের কা'কে এনে দেব
পথের শুরু না শেষ কোনটি বা কার বেশ
শিশির শুকিয়ে গেছে ঘাসে!

ভাষা এক গোধূলিয়া শান্তিছায়া

হাসান হাফিজ

রক্ত পলাশের লাল জড়িয়ে ভরিয়ে আছে
মাতৃভাষা তোমার শরীর
তরুণের লাল রক্ত তোমাকে দিয়েছে দীপ্তি
অহংকার আকাশপ্রতিম
তুমি স্নিগ্ধ তুমি শান্তি তুমি মগ্ন মাতৃক্রোড়
সোঁদামাটি তোমারই বন্দনা করে
তুমি হও জলবতী মেঘের মল্লার
গান হও কোকিলের, গোধূলিয়া ছায়া
ভাষা তুমি অত্যাশ্চর্য ভালোবাসা আনন্দ রঙিন
তুমি এক বিদ্রোহের ভরা নদী
যেখানে জোয়ার আছে তরঙ্গের অহমিকা আছে
ফুল জলধারা আছে আবেগে সোহাগে স্বচ্ছ
তুমি এক নান্দনিক মননেরও নাম।

নিয়ে যাও দিনগুলো

নাজমুল হাসান

নিয়ে যাও দিনগুলো সন্তর্পণে! নিভৃতে আড়ালে কে দাঁড়িয়ে
বাধাহীন দিচ্ছ টান অতলান্ত গহ্বরে
আমার সব সঞ্চয় ও তোমার সঙ্গ-সুখের স্মৃতিগুলো
আজ এই আমি... আমার সমূহ, সংকোচনে পর্যুদস্ত!
এক এক করে গুপ্ত রাতের পর্দাগুলো সরে যায়
নভোমণ্ডল ছাড়িয়ে হাজার আলোকবর্ষ দূরে
কোনো এক ছায়াপথে হয়ত খুঁজে পাবে
এই মোহনীয় শব্দ রূপকল্প আনন্দ-ব্যথার
ভারাক্রান্ত দিনগুলো... ওই গ্রহান্তরে
যখন দুরূহটানে এক এক করে সন্তানের
হয়ত এক বা একাধিক কোমল হাতের স্পর্শ
ছেড়ে যাবে এই মায়াবর্ত থেকে
থাকবে দীর্ঘ গোধূলির কায়া রাতের শিয়রে!
অনভ্যাসে ন্যুব্জ দেহে কড়া দাগ দুহাতের তালুতে
পলি নদীতে মরা জোয়ারে নেমে
আমি দাড়কানা মাছের নিবিষ্ট সাঁতার দেখেছি
শামুক দম্পতি ও ঝিনুকের সংসার
মনে হয়েছে তাদের চেয়ে বেশি কিছু প্রাপ্তি
আমার ঝুলিতেও ছিল না!
ঢেউয়ের ওপর খণ্ড চাঁদের অনবরত সন্তরণ
জীবনের উলটোপিঠে হয়ত এভাবেই
ঠুনকো বোধের আটপৌরে গৃহে মত্ত বেহুঁশ
আছি পড়ে, বোধহীন! কতকাল?

হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন

মুহাম্মদ ইসমাঈল

আর ক'টা ভাত দে না মা? পেটতো অর্ধেকও ভরল না। মা এক দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, পাতিল যে শূন্য।

তাহলে তুমি খাবে কোথা থেকে? তোমার ক্ষিদে পায় না মা? ছেলে প্রশ্ন করে।

মা অশ্রুভরা নয়নে জবাব দেয়, ভাত যদি কপালে থাকত তাহলে তোর বাবাই আজ বেঁচে থাকত। তোদের পাঁচ ভাই-বোন নিয়ে অকূলে ভাসতে হতো না। আজ সারাদিন ঘুরেও একটা কাজ পেলাম না। সবই ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

এতক্ষণ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সবগুলো কথা মনোযোগের সাথে শুনে সবুজ হাত-মুখ না ধুয়ে বেরিয়ে পড়ল এক অজানা উদ্দেশ্যে।

বড়ো ছেলে মা-বাবার আদরের ছেলে। তাই তার নাম রেখেছে সবুজ। নিরুদ্দেশ পথ চলতে চলতে সবুজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটা বটগাছের নিচে সবুজ ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে। মনে হয়, এ বসুন্ধরাতে সবুজের কেউ নেই।

ভোরবেলা এক বুড়ো লোকের ডাকে সবুজের ঘুম ভাঙে। লোকটা দরদভরা প্রশ্ন করে, তুমি এখানে কেন বাবা?

বাড়ি থেকে রাগ করে এসেছ? তুমি কোন শ্রেণিতে পড়? তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার বাবা কী করেন?

একের পর এক প্রশ্নগুলো শুনে সবুজ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এক সময় সবুজ বলে, যারা একবেলা ভালোভাবে খেতে পারে না, যাদের বাবা নেই, যাদের স্কুল নেই, তাদের আবার ক্লাস! এ বলেই পাগলের মতো হো হো করে সবুজ হেসে উঠল।

লোকটা সবুজকে ভালোভাবে দেখল। তার মায়া যেন চারদিকে ঘিরে ফেলেছে। এবার বলল, তুমি জান! আমার কোনো সন্তান নেই। তুমি আমার সন্তানের মতো। তোমাকে আমি অনেক আদর করব। তোমাকে আজকেই স্কুলে ভর্তি করে দেব। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। তুমি স্কুলে ভর্তি হলে সরকার তোমার মাকে গম ও অন্যান্য জিনিস দেবে। তুমি অবৈতনিকভাবে পড়তে পারবে। আমিও তোমাকে সাহায্য করব। তোমার আর কষ্ট থাকবে না।

সবুজ চিন্তায় পড়ে গেল। চিন্তা করতে করতে হঠাৎ করে রাজি হয়ে গেল। খবরটা মাকে শোনানোর জন্য সবুজ বেহুঁশের মতো বাড়ি গেল। বাড়ি যেয়ে দেখে তার হতভাগিনী মা তার চিন্তায় পাগলের মতো কান্নাকাটি করছে। আর ছোটো ভাই-বোনগুলো ক্ষুধায় কাঁদছে। ১২ বছরের সবুজ এ দৃশ্য দেখে মর্মাহত হলো।

সবুজের ছোটোবেলায় তার বাবা মারা গেছে। মা ভাই-বোনদের নিয়ে অনেক দুঃখে দিনাতিপাত করছে। এদিকে বুড়ো লোকটার কথায় সবুজ সুযোগ পেয়ে প্রতিজ্ঞা করল– সে লেখাপড়া শিখবে, মানুষের মতো মানুষ হবে। অভাব-অনটন দূর হবে। তাদের মুখে সে হাসি ফোটাবে।

সবুজ স্কুলে ভর্তি হলো। নিয়মিত পড়াশুনা করতে লাগল। আর বিকেলে রাস্তার এক পাশে বসে পান বিক্রি করে সংসারের খরচ বাবদ কিছু টাকা তার মায়ের হাতে তুলে দেয়। এত কষ্টের মধ্যে থেকেও মা সবুজকে পান বিক্রি করতে না করে। তার লেখাপড়া নষ্ট হবে এই ভেবে।

সবুজ মায়ের কথা শুনে না। একদিকে লেখাপড়া অন্যদিকে পান বিক্রি, এভাবে চলছে সবুজের জীবন-যুদ্ধ।

সবুজ তার মাকে হাঁস-মুরগি লালনপালন ও নানান রকম সবজির বাগান করতে বলে। কারণ সবুজ স্কুলে গিয়ে শুনেছে এসব করলে অনেক লাভবান হওয়া যায়। টিভি ও রেডিওতে সব সময় এগুলো পালনের কথা বলে। তাই সে উৎসাহী হলো।

ধীরে ধীরে সবুজ তার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের জোরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে পাস করে। তার মায়ের মন খুশিতে আটখানা। তাই তার মা কিছু তেলের পিঠা ও নাড়ু দিয়ে সে লোকের কাছে পাঠায়, যে লোক সবুজকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। লোকটিকে সবুজ নানু বলে ডাকে।

সবুজ সালাম করে সুসংবাদটা জানাল। নানু খুশি হয়ে তাকে বুকের মধ্যে চেপে রেখে তার কপালে, নাকে, মুখে চুমু খেল।

সবুজের নানুর ইচ্ছা জাগল তাকে ঢাকায় পড়ানোর জন্য। নানুর সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই।

বহু কষ্টে সবুজকে ঢাকায় তার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় থাকার ব্যবস্থা করে দিল।

সবুজকে তার নানু পথ, ঘাট, কলেজ ও অন্যান্য দরকারি জায়গা চিনিয়ে দিল। সবুজ ঢাকা কলেজে চান্স পেয়ে ভর্তি হলো। সবুজ বুঝতে পারল। বিদ্যার শিখড় যতই তিক্ত হোক না কেন, তার ফল অত্যন্ত মিষ্টি।

যে বাসায় সবুজ থাকে সেখানে চার জনকে পড়াতে হয়। তারপর বাইরে টিউশনি করে। টিউশনি করার পর শর্টহ্যান্ড শেখে। বাদুরের মতো ঝুলতে ঝুলতে বাসে করে কলেজে ক্লাস করে।

এত কষ্ট করার পরও সবুজ শিক্ষা লাভ থেকে সরে আসে না। সে বুঝে কষ্ট করে লেখাপড়া করলে তার মূল্য একদিন না একদিন হবেই।

দুঃখের কথা স্মরণ করে সবুজ ভাবে কবি নজরুল তো গরিব ছিলেন।

আসানসোলে রুটি বানাতেন আর বিক্রি করতেন। কিন্তু তাঁর কবিতা গল্প, উপন্যাস তো গরিব ছিল না। এগুলো আমাদের হৃদয়ের গহীন কোঠায় সঞ্চারিত। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ প্রথম জীবনে একজন কেরানি ছিলেন। আব্রাহাম লিংকন প্রথম জীবনে নৌকার মাঝি ছিলেন। বিজ্ঞানী ড. হেনরী কিসিঞ্জার প্রথম জীবনে লেখাপড়ার সাথে সাথে ৮ ঘণ্টা করে শেভিং ব্রাশ কোম্পানিতে চাকরি করতেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নিউটন প্রথম জীবনে তরকারি বিক্রি করতেন।

এদের প্রাথমিক জীবনের কথা চিন্তা করে সবুজ উৎসাহ পেল। এইচএসসি পরীক্ষায় ও সে জিপিএ-৫ পেল।

এবার সবুজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইংরেজিতে ভর্তি হলো। তার জসীমউদদীন হলে সিট হলো। হলে থেকেই টিউশনি করে ও বৃত্তির টাকা দিয়ে সবুজ তার পড়ার খরচ চালায় এবং কিছু বাড়িতে পাঠায়। তার প্রত্যাশা তার ভাই-বোনরাও যেন তার মতো লেখাপড়া শিখে উচ্চশিক্ষিত হতে পারে।

এদিকে সবুজের মেধা দেখে তার সাথে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের একটা সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সবুজ ক্লাস মিস করে না। সে লেখাপড়ার পাশাপাশি গল্প, কবিতা ও উপন্যাস লেখে। সাহিত্যের এ মেধা কিন্তু সবার হয় না। অনেকে চেষ্টা করেও পারে না। অনেকে আবার এমনিই পারে।

সবুজের বহুমুখী প্রতিভা দেখে তার সহপাঠী সাথী তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করত। সবুজ ছিল বইয়ের পোকা। সারাক্ষণ বই-পুস্তকের গভীরে ডুবে থাকত।

সাথী একদিন তার জন্মদিনে সবুজকে ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদেরকে নিমন্ত্রণ করল। সবুজ ছাড়া সবাই সেখানে যায়।

সবুজ অবশ্য তাকে হুমায়ূন আহমদের একটা বই উপহার দেয়। সবুজ বুঝত সাথী তাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। তবু সবুজ নিজের অতীতের দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ হয়ে যায়।

সবুজের ভালোবাসার প্রতি কোনো খেয়াল নেই। ভার্সিটিতে ক্লাস, টিউশনি, আর মাকে নিয়ে সবসময় চিন্তা করে।

সবুজের কথা বলা, চলাফেরা সবই সাথীকে আকৃষ্ট করে। সবুজের প্রত্যয়ী দৃষ্টির মধ্যে সাথী খুঁজে পায় তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন।

সবুজ কিছুতেই ধরা দেয় না। একদিন সাথী সব লজ্জা উড়িয়ে নিজেই সবুজকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। সবুজ সহাস্যে উত্তর দেয়, ভালবাসা; এটা আমার জন্য মানায় না। তোমরা বড়োলোক, এটা তোমাদেরকে মানায়। আমাকে ভালোবাসাটা তোমার জন্য অন্যায় হবে সাথী। প্রত্যুত্তরে সাথী বলে, সব অন্যায় ডিঙিয়েই আমি তোমায় ভালোবাসি সবুজ এবং ভালোবাসতে চাই সারাজীবন। তোমাকে ছাড়া আর কোনো সবুজ আমি চোখে দেখতে চাই না। যেদিন তোমাকে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে দেখি সেদিনই আমার সমস্ত হৃদয় হারিয়ে গেছে আকাশের নীলিমায়।

সবুজ! প্রেম এক অনন্ত তৃষ্ণা। একগুচ্ছ রক্ত গোলাপ। এক অচিনপুরের পাখি। এক অনন্ত চাওয়ার নাম প্রেম। বিভিন্ন মহা-মনীষীরা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করেছেন প্রেমকে। প্রেমের সংজ্ঞার যেমন শেষ নেই তেমনি শেষ নেই এর চাওয়া-পাওয়ার। প্রেমের কোনো স্থান-কাল পাত্র নেই। তবে সব প্রেমেরই সব চাওয়া-পাওয়া দুটি হৃদয়কে ঘিরে।

প্রত্যেক নারী ও পুরুষের আত্মার মধ্যে এমন একটা ব্যাপার থাকে যা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের ধরাছোঁয়ার বাইরে। একে ধরা যায় না, স্বাদও পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা কেবলই শূন্যতা। একে হারানোও যায় না খুঁজে পাওয়াও যায় না-এর নাম প্রেম।

প্রেম কোনো দূর দেশের পথ কিংবা কোনো সোনার হরিণ নয়। এটা আসলে দুটো হৃদয়ের একটা শক্ত বন্ধন, যে বন্ধনের মধ্যে থাকে পরস্পরের উপলব্ধি, স্বার্থ ত্যাগ আর অকপট নিবেদন। ভালোলাগা থেকে জন্ম নেয় ভালোবাসা।

সাথীর দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য শুনে নীরব থেকে উত্তর দেয় সবুজ, প্লিজ, তুমি এখান থেকে চলে যাও। আমার সম্পূর্ণ পরিচয় জানলে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে। সত্যি! আমি তোমার কাছে সত্যি বলছি। আমার মতো গরিব ছেলেকে ভালোবেসে তোমার কী লাভ? টিউশনি করি। নিজের খরচ, ভাই-বোনদের খরচ সব আমার জোগাড় করতে হয়। আমাদের আছে দুঃখ-বেদনা। ভালোবাসার মূল্যায়ন আমি করতে পারব না।

সাথী শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে। না! না! সবুজ, তুমি আমাকে কথা না দিলে আমি তোমার সামনে আর কোনোদিন আসব না।

আরে পাগল থাম! কথা দিচ্ছি। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

এ কথা বলার সাথে সাথে সাথীর আপাদমস্তক ঠান্ডা হয়ে গেল। সাথী আর সবুজ। সবুজ আর সাথী। দুটি হৃদয় এখন প্রেমের সম্পূর্ণ জোয়ারে ভাসলো। দুজন দুজনকে এখন সম্পূর্ণ ভালোবাসে।

এদিকে তাদের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ।

সবুজ আর সাথীর দিন-কাল বেশ ভালোই চলতে লাগল। এভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন সাথীর চাচাত ভাই মুকুলের হাতে ধরা পড়ল। মুকুল ছেলেটা বখাটে।

কীভাবে সবুজের হলের ঠিকানা নিবে এই চিন্তায় মুকুল অস্থির। একদিন কৌশল করে মুকুল তার ঠিকানাটা সংগ্রহ করল।

এদিকে সাথীর বাসার সবাই বিদেশ ফেরত মুকুলের সাথে সাথীর বিয়ে ঠিক করল। সাথী তাতে রাজি হলো না। সাথীর চারিদিকে প্রতিবন্ধকতার জাল এসে তাকে ঘিরে ফেলেছে। সাথীর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা বন্ধ হয়ে গেল। সাথী তার পরিবারের সবাইকে জানিয়ে দিল সে সবুজকে ভালোবাসে।

সাথীর ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল। সাথীর চাচাত ভাই মুকুল কৌশল অবলম্বন করে কীভাবে সবুজকে সরানো যায়। এভাবে হঠাৎ একদিন সুযোগ পেয়ে সবুজকে গুন্ডাদের হাতে মার খাওয়ালো।

বিছানায় শুয়ে সবুজের চোখে বার বার ভেসে উঠেছে তার মায়ের মুখ। সবুজ মায়ের নামে একটি কবিতা রচনা করল।

দূরে যখন থাকি, মায়ের প্রতিকৃতি আঁকি।
বিপদ যখন আসে, মা যে আমার সকাশে।
অসুখ যখন হয়, মা যে জেগে রয়।
রোদ বৃষ্টি যত, মা যে কাজে রত।
যার কাছেই যাই, মা'র তুলনা নাই।

কবিতাটি লিখতে লিখতে চোখের পানি আর রাখতে পারল না। এদিকে ভাই-বোনদের জন্যও চিন্তা করতে লাগল। হৃদয়ের ক্যানভাস থেকে সাথীকেও সরাতে পারল না সবুজ। দুদিন পর সবুজ সাথীর আবেগঘন ভাষায় লেখা একটা চিঠি পেল।

যেদিন সাথীর চিঠি পেল সেদিনই সবুজ অনার্সের রেজাল্ট পেল। সবুজ ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হলো। সবুজ খুশি হয়ে এক বন্ধুকে দিয়ে মিষ্টি, কিছু রজনীগন্ধা ও একটা চিরকুট লিখে সাথীর বাসায় পাঠিয়ে দিল।

মিষ্টি, ফুল আর চিরকুট গিয়ে পৌঁছাল সাথীদের কাজের মেয়ের হাতে। কাজের মেয়েটি তেমন চালাক নয়। সে সাথীর মায়ের সম্মুখে সাথীর হাতে সব পৌঁছে দিল।

সাথীর হাত থেকে সবগুলো জিনিস নিয়ে দেখে এবং পরে জানালা দিয়ে ফেলে দেয় মা। আর সাথীকে অনেক বকাঝকা করল। সাথী নিশ্চুপ। কিছু বলল না।

এদিকে ঈদের দুদিন আগে মা ও ভাই-বোনদের জন্য কাপড়চোপড় ঈদের যাবতীয় জিনিস কিনে সবুজ লঞ্চযোগে রওয়ানা হলো বাড়ির উদ্দেশে। মাঝ নদীতে যাওয়ার পর প্রবলবেগে ঝড় উঠে ডুবে যায় লঞ্চ। অন্যান্যদের সাথে সবুজও হারিয়ে যায় চিরদিনের তরে। হারিয়ে গেল সবুজ। হারিয়ে গেল তার সব স্বপ্ন। তার-প্রেম।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৩০শে জানুয়ারি ২০১৯ একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দেন (জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা)–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন মন্ত্রিসভায় শপথ বাক্য পাঠ করালেন রাষ্ট্রপতি

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের পর ৭ই জানুয়ারি বঙ্গভবনে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। রাষ্ট্রপতি প্রথমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শপথ বাক্য পাঠ করান। আর এরই মাধ্যমে চতুর্থবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শেখ হাসিনা। এরপর রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রীদের পর্যায়ক্রমে শপথ পড়ান।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্‌বোধন

৯ই জানুয়ারি রাজধানীর শেরেবাংলা নগর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৯-এর আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, নতুন নতুন উদ্ভাবনের ফলে প্রকৃতি দ্রুত পালটাচ্ছে। তাই আপনাদেরকে নতুন নতুন ধারণা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে হবে। এতে করে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ বাড়বে। ফলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাবে। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, এ বছর কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যকে প্রোডাক্ট অব দ্য ইয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। ৮ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ মেলা চলবে।

বেসরকারি পর্যায়েও ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, 'বর্তমান সরকার দেশে খেলাধুলার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে অবকাঠামো সুবিধাসহ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। আশা করব সরকারের পাশাপাশি সমর্থবান ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও করপোরেট হাউজ বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজনে এগিয়ে আসবেন। তাহলেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে আমাদের আরো সাফল্য আসবে।'

২৩শে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭)'-এর ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, 'আশা করি, তৃণমূল থেকে উঠে আসা এসব প্রতিভাবান খেলোয়াড় আগামী দিনে বাংলাদেশের জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং সেই সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে সক্ষম হবে।' ফাইনালে রাজশাহীকে ২-১ গোলে হারায় রংপুর বিভাগ। পরে চ্যাম্পিয়ন রংপুর বিভাগ ও রানার্স আপ রাজশাহী বিভাগের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দেন রাষ্ট্রপতি।

মিরপুর সেনানিবাসে ২৩শে ডিসেম্বর শেখ হাসিনা কমপ্লেক্সে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ২০১৮-এ অংশগ্রহণকারীদের মাঝে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ–পিআইডি

সাইবার ক্রাইম নিয়ে সশস্ত্রবাহিনীকে জানতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, একটি পেশাদার ও প্রশিক্ষিত সশস্ত্রবাহিনী জাতীয় উন্নয়ন এবং নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সশস্ত্রবাহিনীর পেশাদারিত্ব অর্জনের জন্য সদা পরিবর্তনশীল যুদ্ধ-কৌশল ও তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশের দিকেও লক্ষ রাখতে হবে। এছাড়া প্রযুক্তির প্রসার সাইবার ক্রাইমের মাত্রাকেও বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই তথ্যপ্রযুক্তি ও তার অপপ্রয়োগ সম্পর্কেও কর্মকর্তাদের সম্যক ধারণা থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

২৩শে ডিসেম্বর মিরপুর সেনানিবাসের সামরিকবাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজে (ডিএসসিএসি) ন্যাশনাল ডিফেন্স-কোর্স ও এএফডব্লিউ কোর্সের সমাপন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, একবিংশ শতাব্দীর বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়নে ফোর্সেস-গোল ২০৩০ বাস্তবায়ন করছে। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও এএফডব্লিউ কোর্স সম্পন্নকারী কর্মকর্তাদের অ্যাওয়ার্ড ও সনদ প্রদান করেন।

বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে রাষ্ট্রপতি

১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের ৪৫তম বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। এদিন সকালে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তিনি শ্রদ্ধা জানান। স্মৃতিসৌধের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতাযুদ্ধে শহিদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এছাড়া বিজয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে সংবর্ধনার আয়োজন করেন। এ সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী অংশ নেন এবং বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যরাও এ সংবর্ধনায় যোগ দেন।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চতুর্থবার শপথ গ্রহণ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পর টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৭ই জানুয়ারি ২০১৯ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। তিনি ১৯৯৬ সালে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং ২০০১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সবচেয়ে বেশি সময় প্রধানমন্ত্রী থাকা ও জাতীয় সংসদের নেতা হওয়ার রেকর্ড গড়েছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, সশস্ত্রবাহিনী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ২৪ জন মন্ত্রী, ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ৩ জন উপমন্ত্রীও শপথ গ্রহণ করেন।

৩২ নম্বরে জাতির পিতা ও সাভারে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

শপথ গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই জানুয়ারি ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিকেলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর নবনিযুক্ত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়ে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে যান। স্মৃতিসৌধের বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই জানুয়ারি ২০১৯ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন–পিআইডি

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই জানুয়ারি টুঙ্গিপাড়ায় যান। টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী ফাতিহা পাঠ করেন এবং দেশ, জাতি ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি এবং '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট তাঁর পরিবারের নিহত সদস্যদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। এ সময় তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানাও উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই জানুয়ারি সকালে ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্রবাহিনীর শহিদ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। শপথ গ্রহণের পর সশস্ত্রবাহিনী বিভাগে নিজের কার্যালয়ে প্রথম কর্মদিবসের প্রথম ভাগ কাটান প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানা তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর ১৩ই জানুয়ারি তাঁর কার্যালয়ে প্রথম অফিস

১৭ই জানুয়ারি ২০১৯ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

করেন এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে তিনি জনগণের কাছে দেওয়া ওয়াদা পূরণে কাজ করার জন্য কর্মকর্তাদের তাগাদা দেন। তিনি সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ এবং মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়া দুর্নীতি যেন উন্নয়নের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে সেলক্ষ্যে তৎপর থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ১৬ই জানুয়ারি তাঁর কার্যালয়ে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ রেজা নাওফর সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে সৃষ্ট সংঘাতে ওই দেশগুলোর জনগণকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। এজন্য মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তিনি। দুই দেশের মধ্যে অভিন্ন সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে– সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়।' স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের উত্তরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রদূত। তিনি বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক সুন্দর অবস্থানে রয়েছে বলে উল্লেখ করেন এবং দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জানুয়ারি সচিবালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পরিদর্শন এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রাষ্ট্র পরিচালনার হার্ট জনপ্রশাসন'। তাই জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের সততা ও আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি সুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং তৃণমূল পর্যন্ত কেউ দুর্নীতি করলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কাজের খোঁজখবর নেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ড নিয়ে নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে জানুয়ারি সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক সমাজের কালো ব্যাধি। এটা সমাজের উন্নয়ন ব্যাহত করে। তাই দেশকে উন্নত করতে হলে এ ব্যাধি দূর করতে হবে। তিনি দুর্নীতি, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ এবং মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বহুমুখী পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে সচেতনতা সৃষ্টির নির্দেশনা দেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী সড়কে যানজট কমাতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন এবং ট্রাফিক জ্যাম সমস্যা সমাধানে আরো আন্ডারপাস ও ফুটওভার ব্রিজের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ও চালকদের সচেতনতা বাড়ানোর ওপরও জোর দেন।

সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে জানুয়ারি তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জনগণের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে তা পালন করতেই আমরা সরকারে এসেছি।' এ লক্ষ্যে তিনি মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। বৈঠকে মন্ত্রিসভায় পাঁচটি আইনের খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়। নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়েদাদ-২০১৮ পরীক্ষার নিমিত্তে ইতিপূর্বে গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটি পুনর্গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। এছাড়া ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন ২০১৮-এর খসড়া ও চিটাগাং হিলট্র্যাক্স (ভূমি অধিগ্রহণ) রেজুলেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০১৯-এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন ২০১৮-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র আইন ২০১৮-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৫-এর আলোকে প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনার খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে জানুয়ারি শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের নেওয়া প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আনা ও যথাযথভাবে কাজ শেষ করতে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেন। এছাড়া সভায় ৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ রোল মডেল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে জানুয়ারি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সিভিল মিলিটারি সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় রিজিওনাল কনসালটেটিভ গ্রুপের চতুর্থ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ এখন 'রোল মডেল' হিসেবে পরিচিত। তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এশীয়-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে প্রতিবেশীদের মধ্যে সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং বড়ো আকারের বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে জানুয়ারি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন এবং মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তিনি যেসব চিকিৎসক জেলা হাসপাতালে যেতে চাইবেন না তাদের ওএসডি করে নতুন নিয়োগ দেওয়ারও নির্দেশ দেন। এছাড়া সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের যেন বাইরে গিয়ে রোগী দেখতে না হয় সেজন্য 'বিশেষ ধরনের সেবা' চালুর নির্দেশ দেন। তিনি নার্সদের প্রতি সম্মান দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন এবং বাধ্যতামূলকভাবে তাদের রোগীর সেবা করার নির্দেশ দেন। না করলে চাকরিতে থাকার দরকার নেই বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। সারাদেশে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের পাশাপাশি চিকিৎসক তৈরি এবং তাদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে প্রতিটি বিভাগে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় করে দেওয়ার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদকে ২২শে জানুয়ারি ২০১৯ মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বিভিন্ন সংগঠন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিবর্গ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়–পিআইডি

তথ্য মন্ত্রণালয় : বিশেষ প্রতিবেদন

গণমাধ্যমকে সাথে চাই প্রধানমন্ত্রীর ইশতেহার বাস্তবায়নে

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ মহান কাজে দেশের সকল গণমাধ্যমকে সাথে চাই। ৮ই জানুয়ারি তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মিলিত হয়ে নবনিযুক্ত তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এ কথা বলেন।

তথ্য মন্ত্রণালয়কে রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে অভিহিত করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রের আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগের পর চতুর্থ স্তম্ভ হলো গণমাধ্যম। নির্বাহী বিভাগের সাথে গণমাধ্যমের সহযোগিতার বন্ধনে রাষ্ট্র উপকৃত হয়, দেশ এগিয়ে যায়। গণমাধ্যম সমাজের দর্পণ। সমাজকে নির্মাণ ও সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে গণমাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই।

তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, মানুষের উন্নতির জন্য যেমন স্বপ্ন প্রয়োজন, দেশের উন্নতির জন্যও তাই। এ জন্যই জাতিকে স্বপ্ন দেখতে হয়। যে দেশে পঞ্চাশের দশক থেকেই খাদ্য ঘাটতি, মানুষের ঘনত্ব সর্বোচ্চ, মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ সর্বনিম্ন, সে দেশকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু স্বপ্নই দেখাননি, বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের কাতার থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করেছেন।

২০০৮ সালের নির্বাচনে জাতিকে আমরা যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম, তা যেমন বাস্তবায়ন করেছি, ২০১৮ সালের নির্বাচনে দেখানো স্বপ্নও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা বাস্তবায়ন করব অঙ্গীকার করে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, এ স্বপ্ন পূরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ।

দেশের উন্নতির জন্য মেধা, মনন ও দেশাত্মবোধের সমন্বয়ের বিকল্প নেই উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যমের একটি ছোট্ট সংবাদ যেমন সমাজে অনেক তুলকালাম ঘটিয়ে দিতে পারে, একই সাথে নতুন প্রজন্মের মনন তৈরিতে, প্রতিটি হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করতে এবং মানুষের মাঝে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতেও ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে গণমাধ্যম। আমার বিশ্বাস, গণমাধ্যম তা করবে।

রাজনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অসামান্য

রাজনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গণমাধ্যমের ভূমিকাকে অসামান্য বলে উল্লেখ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। ১৪ই জানুয়ারি রাজধানীর তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেস ক্লাব ব্রিফিং লাউঞ্জে প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে তথ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম বৈঠকে এ কথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, সাংবাদিকতা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। কিন্তু রাজনীতি আরো ঝুঁকিপূর্ণ এবং দেশ সেবার মহান ব্রত । দেশের সেবা, সমাজ পরিবর্তন এবং সমাজ উন্নয়নই হচ্ছে রাজনীতির মূল লক্ষ্য। রাজনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যমন্ত্রী হিসেবে সাংবাদিকদের সকল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আইনের মাধ্যমে সমাধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আবাসনসহ সাংবাদিকদের কল্যাণের বিষয়টি আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখ রয়েছে। প্রেস ক্লাবের ৩১ তলা ভবন ও বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কমপ্লেক্সের কাজ দ্রুততম সময়ে শুরুর লক্ষ্যেও কাজ করবে তথ্য মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী নেতৃত্বে সামাজিক ও অনলাইন গণমাধ্যমের বিকাশ গণমাধ্যমের ক্যানভাসকেই পালটে দিয়েছে। যেকোনো মানুষ সংবাদ মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই নিজস্ব মতামত ও অনুভূতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন, যা বহু মানুষ দেখতে পারে। এর মাধ্যমে গুজব রটানোর মতো অকল্যাণকর পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। এমন পরিস্থিতি আমাদের সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

বই উৎসব

১লা জানুয়ারি: বছরের প্রথম দিনে সারাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন বই বিতরণ করা হয়। নতুন বই পেয়ে উৎসবে মেতে ওঠে ছাত্রছাত্রীরা।

একাদশ সংসদ নির্বাচনে বিজয়ীদের শপথ গ্রহণ

৩রা জানুয়ারি: একাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সাংসদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদ ভবনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ করান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ

৭ই জানুয়ারি: বঙ্গভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন শেখ হাসিনা।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

১০ই জানুয়ারি: বিভিন্ন সংগঠন নানা আয়োজনে পালন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস।

বিশ্বে দশকসেরা ১০ চিন্তাবিদের মধ্যে শেখ হাসিনা

২২শে জানুয়ারি: ওয়াশিংটন ভিত্তিক ম্যাগাজিন ফরেন পলিসির গত এক দশকের বিচারে শীর্ষ ১০০ বৈশ্বিক চিন্তাবিদের তালিকায় রয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তালিকায় শেখ হাসিনা প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্যাটাগরিতে শীর্ষ ১০ বৈশ্বিক চিন্তাবিদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি পান।

জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস

২৩শে জানুয়ারি: বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি (বিএসটিডি) কর্তৃক ২৩তম জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়।

গণ-অভ্যুত্থান দিবস পালিত

২৪শে জানুয়ারি: বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থান দিবস।

জাতীয় সবজি মেলা

প্রতিবারের ন্যায় এবারও (২৪-২৬) জানুয়ারি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় সবজি মেলার আয়োজন করা হয়। এ বছর সবজি মেলার প্রতিপাদ্য ছিল, 'নিরাপদ সবজি করব চাষ, পুষ্টি মিলবে বারো মাস'।

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

২৫শে জানুয়ারি: জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন চত্বরে চতুর্থবারের মতো 'জাতীয় সবজি মেলা ২০১৯' আয়োজন করে কৃষি মন্ত্রণালয়

পুলিশ সেবা সপ্তাহ

২৭শে জানুয়ারি: পুলিশি সেবা পাওয়ার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে ও পুলিশি সেবা সহজ করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী 'পুলিশ সেবা সপ্তাহ' অনুষ্ঠিত হয়।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

২৮শে জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯-এর খসড়া চূড়ান্ত ও নীতিগত অনুমোদন লাভ করে।

একনেক সভা

২৯শে জানুয়ারি: শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় নয়টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

একাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন

৩০শে জানুয়ারি: একাদশ জাতীয় সংসদ-এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্‌বোধন

২৪তম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্‌বোধন হয় ৯ই জানুয়ারি রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। মাসব্যাপী এ মেলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের পণ্য সম্ভার নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে।

সরকারকে বিভিন্ন দেশের অভিনন্দন

টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানরা অভিনন্দন জানিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন সার্ভিয়ার প্রধানমন্ত্রী, ক্রোয়েশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী এবং বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ওআইসির মহাসচিবও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে।

২০শে জানুয়ারি জেদ্দায় ওআইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এক বৈঠকের সূচনা বক্তব্যে সংস্থার মহাসচিব ড. ইউসেফ বিন আহমদ আল ওথাইমিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের শান্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

নয়টি দেশের একটি বাংলাদেশ

চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সারাবিশ্বে মাত্র ৯টি দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। এসব দেশের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার ৪টি ও আফ্রিকার ৫টি দেশ আছে। এই ৯টি দেশের মধ্যে একটি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য ৮টি দেশ হলো– ভারত, ভুটান, মালদ্বীপ, জিবুতি, আইভরি কোস্ট, ইথিওপিয়া, ঘানা ও রুয়ান্ডা। তবে এই দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশকেই উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৮ই জানুয়ারি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টাস-২০১৯' প্রতিবেদনে প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে এ পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের মতে, দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত অগ্রসরমান অর্থনৈতিক অঞ্চল। মূলত ব্যক্তি খাতের ভোগ চাহিদা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে এই অঞ্চল অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর হওয়ার অন্যতম কারণ।

ধনী বৃদ্ধির হারে তৃতীয় বাংলাদেশ

অতি ধনী বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম । এবার ধনী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের দিক থেকেও বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়েলথএক্স, 'গ্লোবাল এইচএনডব্লিউ অ্যানালিসিস: দ্য হাই নেট ওর্থ হ্যান্ডবুক'–শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। সংস্থাটি বলছে, সামনের পাঁচ বছরে বাংলাদেশে ধনী মানুষের সংখ্যা ১১.৪ শতাংশ বাড়বে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১০টি দেশ ধনী বৃদ্ধির হারে শীর্ষে থাকবে। ধনী বৃদ্ধি হারে সর্ব শীর্ষে থাকবে নাইজেরিয়া। দ্বিতীয় মিসর। এর পরের অবস্থানে বাংলাদেশ।

তবে দ্রুত মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি বা ধনী হওয়ায় বাংলাদেশ এগিয়ে থাকলেও অতি গরিব মানুষের সংখ্যাও কম নয়। অতি গরিব মানুষের সংখ্যা বেশি এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। বাংলাদেশে ২ কোটি ৪১ লাখ হতদরিদ্র মানুষ আছে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

ইলিশের সাফল্য

ইলিশ নিয়ে আরেকটি সাফল্য পেল বাংলাদেশ। ভৌগোলিক নির্দেশক জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতির পর বাংলাদেশ এবার ইলিশের জীবন রহস্য উদ্ঘাটনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল।

সেপ্টেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশি গবেষক দল উদ্ভাবিত পদ্মার ইলিশের জিন বিন্যাস জিআই নোমসিকোয়েন্স বিশ্বখ্যাত জার্নাল বায়োমেড সেন্ট্রাল (বিএমসি) প্রকাশ করেছে। লন্ডনভিত্তিক জার্নালটিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়।

ইলিশের জিন তত্ত্বের ওপর কাজ করা বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিএমসিতে বাংলাদেশের গবেষণাটি সবার আগে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টিকে অনন্য গৌরব বলে মনে করছেন গবেষকরা। এর আগে ২০১৭ সালে বাংলাদেশের ইলিশ ভৌগোলিক নির্দেশক জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

বিএমসিতে গবেষণাটি প্রকাশিত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রাণ রসায়ন অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হাসিনা খান জানান, বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ এই স্বীকৃতি পেল। প্রকাশনার আগের প্রক্রিয়া হিসেবে উদ্ঘাটন বিষয়ক সমস্ত তথ্য যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জিন ব্যাংক ন্যাশনাল সেন্টার

ফরবায়ো টেকনোলজি ইনফর্মেশনে (এনসিবিআই) জমা দিতে হয়েছে। তথ্য যাচাই শেষ হওয়ার পর প্রকাশনার জন্য সবকিছু বিএমসিতে দিতে হয়েছে। বিএমসিও সেটা সময় নিয়ে পর্যালোচনা করেছে।

সবশেষ দুই সপ্তাহ আগে বিএমসি যোগাযোগ করে জানায়, ইলিশের জিন বিন্যাসে বাংলাদেশের গবেষণালব্ধ তথ্য তারা প্রকাশ করেছে।

গণতন্ত্রের সূচকে উন্নতি

বর্তমান সরকারের জন্য সুখবর বয়ে এনেছে ইকনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স-এর গণতন্ত্র সূচক। এ সূচকে চার ধাপ এগিয়ে এবার বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮তম। ৯ই জানুয়ারি ২০১৯ এ সূচক প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক সাময়িকী *দ্য ইকোনমিস্ট*-এর ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। পাঁচটি মানদণ্ডে ২০১৮ সালের পরিস্থিতি বিচার করে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। মূল্যায়নের ১০ পয়েন্টের মধ্যে এবার বাংলাদেশের স্কোর ৫ দশমিক ৫৭। আগের বছর ছিল ৫ দশমিক ৪৩।

২০১৮ সালের গণতান্ত্রিক বৈশ্বিক সূচকে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে নরওয়ে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে যথাক্রমে আইসল্যান্ড ও সুইডেন। চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে আছে নিউজিল্যান্ড ও ডেনমার্ক। আর সবার নিচে অর্থাৎ ১৬৭তম অবস্থানে রয়েছে উত্তর কোরিয়া।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ৪১তম, শ্রীলঙ্কা ৭১তম ও পাকিস্তান আছে ১১২তম অবস্থানে। আর যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ২৫তম ও যুক্তরাজ্য ১৪তম অবস্থানে রয়েছে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

আইএমইআই তথ্যভাণ্ডার তৈরি করছে সরকার

ফোনের ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি (আইএমইআই) নম্বরের তথ্যভাণ্ডার (ডেটাবেইস) তৈরি করছে সরকার। জানুয়ারি মাস থেকেই এ কাজ শুরু হয়েছে। ডিসেম্বর নাগাদ এর সুবিধা পাওয়া যাবে। ১০ই জানুয়ারি রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) স্মার্টফোন ও ট্যাব মেলার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এ কথা বলেন।

প্রতিটি হ্যান্ডসেটে ১৫ সংখ্যার একটি নম্বর থাকে, যা আইএমইআই নামে পরিচিত। এক হ্যান্ডসেটের আইএমইআই নম্বর অন্য হ্যান্ডসেটের আইএমইআই নম্বর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। হ্যান্ডসেটে *#০৬# পর পর চাপলে আইএমইআই নম্বর জানা যায়। অপরাধী শনাক্তকরণ কাজে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলো আইএমইআই নম্বর ব্যবহার করে থাকে।

তিন দিনের স্মার্টফোন ও ট্যাব মেলার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রাথমিক স্তর থেকে প্রোগ্রামিং শেখানোর কথা বলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী। জানা যায়, আইএমইআই ডেটাবেইস তৈরি হয়ে গেলে কোন মোবাইলে কোন সিম আছে বা কোন মোবাইলে কী করা হচ্ছে তা জানা যাবে।

বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্পবিপ্লব গ্রহণ করতে প্রস্তুত

বাংলাদেশে শীর্ষস্থানীয় তথ্যপ্রযুক্তি পরামর্শক ও সফটওয়্যার সল্যুশন কোম্পানি ই-জেনারেশন ১২ই জানুয়ারি রাজধানীর ব্র্যাক ইন অডিটোরিয়ামে 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব– আমরা কি প্রস্তুত?' শীর্ষক গোলটেবিল সেশনের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। ই-জেনারেশনের পরিচালক (ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন) মুশফিক আহমেদ অনুষ্ঠানে 'মেশিন এজ: চতুর্থ শিল্প বিপ্লব' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এরপর সকল আলোচকদের অংশগ্রহণে উন্মুক্ত প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মোস্তাফা জব্বার বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপ যেমন– একটি বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ ডিজিটাল রূপান্তরে সরকারের অন্যান্য পদক্ষেপ বিশ্বের নানা দেশ অনুকরণ করছে।

তিনি জানান, বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্পবিপ্লব গ্রহণ করতে প্রস্তুত। বর্তমান সরকার এই বিপ্লবের জন্য আবশ্যক তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা ও জনবল তৈরিতে প্রধান গুরুত্ব দিচ্ছে। এছাড়া ডিজিটাল সিকিউরিটি নিশ্চিত করাও অগ্রাধিকার হিসেবে আছে।

ট্রেনের টিকিট কিনতে লাগবে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর

অনলাইনে ট্রেনের টিকিট কাটতে হলে এখন থেকে পূরণ করতে হবে যাত্রীর নাম, মোবাইল ও জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মসনদ নম্বর। পাইলট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৮ই জানুয়ারি শুধু সোনার বাংলা ট্রেনের অনলাইন টিকিটে এটা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। ফলে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটের সোনার বাংলা ট্রেনের অনলাইনে টিকিটের ক্ষেত্রে বছরের প্রথম দিন থেকেই লাগছে যাত্রীর নাম, মোবাইল ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর।

এক্ষেত্রে টিকিট কাটতে হলে যাত্রীকে নাম, মোবাইল নম্বর, এনআইডি অথবা জন্ম নিবন্ধন নম্বর ইনপুট দিতে হবে। পাইলট প্রকল্পের অংশ হিসেবে সোনার বাংলা ট্রেনের ১৫ ভাগ টিকিটে এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে সব ট্রেনে এটি চালু করবে বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ডিজিটাল বিপ্লবের ১০ বছর তুলে ধরছে 'আমরাই ডিজিটাল বাংলাদেশ'

ডিজিটাল বিপ্লবের ১০ বছরের সাফল্যগুলো তুলে ধরছে তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তা ফোরাম 'আমরাই ডিজিটাল বাংলাদেশ'। এরই অংশ হিসেবে ২৬শে ডিসেম্বর রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয় এক আলোচনা সভা।

'ডিজিটাল বিপ্লবের ১০ বছর: শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ'

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ১০ই জানুয়ারি ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্মার্ট ফোন ও ট্যাব মেলা উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

শীর্ষক আলোচনাসভায় আলোচকরা বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। একই সঙ্গে আলোচকরা আশা করেন, বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের দ্বিতীয় পর্বের কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়াবে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে ডিসেম্বর গণভবনে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে তিনি শিশুদের হাতে নতুন বই তুলে দেন এবং গণভবনের লনে শিশুদের সঙ্গে আনন্দমুখর সময় কাটান।

জেএসসি, জেডিসি, পিইসি ও এবতেদায়ি পরীক্ষার ফল হস্তান্তর

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ২৪শে ডিসেম্বর গণভবনে জেএসসি, জেডিসি, পিইসি ও এবতেদায়ি পরীক্ষার ফলাফল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে হস্তান্তর করেন। ফল হস্তান্তরকালে প্রধানমন্ত্রী কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স সমমান প্রদানের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে তাঁর সরকারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। যারা পরীক্ষার ফলাফলে কৃতকার্য হয়েছে তাদের এবং শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকলকে অভিনন্দন জানান এবং যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদেরকে আরো মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনার পরামর্শ দেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১লা জানুয়ারি আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে পাঠ্যপুস্তক উৎসব ২০১৯-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করেন–পিআইডি

দেশব্যাপী বই উৎসব পালিত

আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে ১লা জানুয়ারি ২০১৯ বই উৎসবের উদ্‌বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে নবম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল, মাদ্রাসা ও ভোকেশনালের ৪ কোটি ২৬ লাখ ১৯ হাজার ৮৬৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে মোট ৩৫ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮২টি নতুন বই বিতরণ করেছে সরকার । নতুন বই পেয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দিত। এছাড়া অন্যান্যবারের মতো এবারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য ৫টি ভাষার বই বিতরণ করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝেও বিতরণ করা হয়েছে ব্রেইল বই। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে ২ কোটি ৩৯ লাখ ৬৫ হাজার ১৫১ শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন বইয়ের পাশাপাশি অনুশীলন খাতাও বিতরণ করা হয়।

ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফি আদায়ে কঠোর ব্যবস্থা

নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফি আদায় নিয়মবহির্ভূত কাজ এবং অন্যায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি নেওয়া হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি ১১ই জানুয়ারি চাঁদপুর সদর উপজেলায় নির্বাচন-পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময়কালে একথা বলেন।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর দেশের সবচেয়ে বড়ো অর্থনৈতিক অঞ্চল

চট্টগ্রামের মিরসরাই এবং ফেনীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে ১৪ই ডিসেম্বর একটি ডেনিম কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে শিল্প স্থাপনের যাত্রা শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর হবে দেশের সবচেয়ে বড়ো অর্থনৈতিক অঞ্চল। এর আকার হবে ৩০ হাজার একর। চলতি বছরের নভেম্বর মাসে কারখানাটি উৎপাদন শুরু করবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানকে জমি বরাদ্দ দিয়েছে। তবে প্রথম কারখানা করছে আরমান হক ডেনিম নামের একটি প্রতিষ্ঠান। তারা ১০ একর জমির উপরে ডেনিম কাপড় উৎপাদনের কারখানা করছে।

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে কারখানা নির্মাণ শুরুকে দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর জন্য একটি বড়ো মাইলফলক বলে মনে করছে বেজা। বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর চট্টগ্রামের মিরসরাই ও ফেনী ঘিরে প্রতিষ্ঠিত। বেজার এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে ৪৯টি বিনিয়োগ প্রস্তাবের বিপরীতে ৩ হাজার ৮৮৭ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। মিরসরাইয়ে এখন ভূমি উন্নয়নের পাশাপাশি গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলছে। এ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য আলাদা একটি বন্দর থাকবে, যেটি দিয়ে সহজেই চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বন্দরে পণ্য আনা-নেওয়া করা যাবে।

ইউরোপের বাজারে বগুড়ার ঝুড়ি

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার গ্রামীণ নারীদের তৈরি হস্তশিল্প পণ্য রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপের ১৮টি দেশে। ক্লাসিক্যাল হ্যান্ড মেইড প্রোডাক্টস বিডি নামে একটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বগুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের নারীদের হাতে তৈরি ঝুড়ি রপ্তানি করছে। এ পণ্য রপ্তানি করে বছরে ১ দশমিক ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হচ্ছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এই রপ্তানি আয়ের পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি ৮ লাখ টাকা।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানির আয় বাড়ছে। গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৬৬ লাখ ডলার। সেখানে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছয় মাসে রপ্তানি হয়েছে ১ কোটি ৮ লাখ ডলারের পণ্য। এ আয় গত অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের চেয়ে ৩৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ৭৮ কোটি ডলারের হস্তশিল্প পণ্য রপ্তানি হয়।

জাপানি বিনিয়োগ পেল মেঘনা

বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন একটি জাপানি কোম্পানির বিনিয়োগ পাচ্ছে। জাপানের সাকাতা ইঙ্কস সেখানে একটি কালি উৎপাদনের কারখানা করবে। ৩রা জানুয়ারি এ বিনিয়োগের জন্য সাকাতা ও মেঘনার মধ্যে জমি ইজারার চুক্তি সই হয়।

সাকাতা ইঙ্কস বিশ্বের কালির বাজারে একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। সাকাতার কারখানা চালু হলে ভারত থেকে বাংলাদেশের কালি আমদানি কমবে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশে সৌদি'র আরো বিনিয়োগ প্রস্তাব

বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে কয়েকশ কোটি ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে সৌদি আরব। সংশ্লিষ্ট সৌদি সরকারি কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে দৈনিক জনকণ্ঠ ২৪শে জানুয়ারি ২০১৯ এ সংক্রান্ত একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে একটি উচ্চ পর্যায়ের সৌদি প্রতিনিধিদল আগামী মাসে বাংলাদেশ সফর করবে।

সম্প্রতি সৌদি আরব বাংলাদেশে বড়ো অঙ্কের বিনিয়োগ প্রস্তাব বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে অল্প কিছুদিনের মধ্যে সৌদি আরবের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারি চারটি দফতরের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরে আসছে। সফরকারী প্রতিনিধিদলটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডা, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য, শিল্প ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হবেন।

প্রসঙ্গত, সৌদি আরব বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সৌদি সফরকালে এ নিয়ে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরের পর সৌদি বিনিয়োগকারীরা কয়েকবার বাংলাদেশ সফর করেছেন। সৌদি আরবের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এমওইউ অনুযায়ী, দেশটির আলফানা কোম্পানি বাংলাদেশে ১০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে বিনিয়োগ করবে। ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন্স নামের একটি সৌদি প্রতিষ্ঠান ছাতক সিমেন্ট কারখানার মানোন্নয়ন করে কাফকো মডেলে প্ল্যান্ট নির্মাণ করবে। এছাড়া দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিবছর বাড়ছে।

স্মরণযোগ্য, লন্ডনের জ্যেষ্ঠ ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে কমনওয়েলথভুক্ত সরকার প্রধানদের এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে এশিয়ার সেরা বিনিয়োগ হাব হিসেবে উল্লেখ করে বিশ্বের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে। বর্তমান সরকার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল

প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে এবং অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করছে।

বিশ্বের তৃতীয় দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

চলতি বছর বিশ্বের তৃতীয় দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এই অবস্থানে থাকবে। সম্প্রতি জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে এসডি এশিয়া। গণমাধ্যমটির ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির দিক থেকে শীর্ষে থাকবে সুদান। এই তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবে ভারত। তালিকায় বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে আছে; যেখানে বাংলাদেশের প্রত্যাশিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ৬ শতাংশ। জাতিসংঘের 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক সিচুয়েশন অ্যান্ড প্রসপেক্টস' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৯ সালে শক্তিশালী স্থায়ী বিনিয়োগ, বর্ধনশীল বেসরকারি খাত এবং মুদ্রানীতির কারণে এই অবস্থানে থাকবে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: এস আর সবিতা

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বের দীর্ঘমেয়াদি নারী সরকার প্রধান হওয়ার পথে শেখ হাসিনা

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি নারী সরকার প্রধানের রেকর্ড গড়ার পথে পা দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৭ই জানুয়ারি টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে বিশ্বে এখন সবচেয়ে বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা নারী সরকার প্রধানের এলিট ক্লাবে প্রবেশ করেন তিনি। আগামী পাঁচ বছর সফলভাবে দেশ পরিচালনা করার মাধ্যমে এটি পূর্ণতা পাবে। এই শপথের মাধ্যমে চতুর্থবার সরকার প্রধান হওয়ারও গৌরব অর্জন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হন তিনি এবং ২০১৪ সালের ১২ই জানুয়ারি তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শেখ হাসিনা।

এবারই সবচেয়ে বেশি নারী প্রার্থীর জয়

স্বাধীনতার পর এবারই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নারী প্রার্থী সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২২টি আসনে নারী প্রার্থীরা জিতেছেন। এর মধ্যে ১৯ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের, জাতীয় পার্টির রয়েছেন ২ জন এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) থেকে ১ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এবারের নির্বাচনে ৬৮ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২০১৪ সালের নির্বাচনে ১৯ জন নারী নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বেগম রোকেয়া পদক পেলেন পাঁচ নারী

নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৮-এর দেশের পাঁচজন বিশিষ্ট নারীকে বেগম রোকেয়া পদকে ভূষিত করা হয়। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৯ই ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত রোকেয়া পদক ২০১৮ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁদের হাতে পদক তুলে দেন।

পদকপ্রাপ্ত পাঁচ নারী হলেন– সাবেক প্রতিমন্ত্রী জেবুন্নেসা তালুকদার, কুমিল্লা মহিলা কলেজের সাবেক শিক্ষয়িত্রী অধ্যাপক জোহরা আনিস, সুনামগঞ্জের বিশিষ্ট সমাজ ও সংস্কৃতিকর্মী শিলা চৌধুরী, বিশিষ্ট লেখিকা ও সমাজকর্মী রমা চৌধুরী এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লেখিকা ও সমাজকর্মী রোকেয়া বেগম। অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিল মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

পাঁচ জয়িতা পুরস্কৃত

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার পাঁচ নারীকে জয়িতা নির্বাচন করে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ১০ই ডিসেম্বর উপজেলা প্রশাসন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেয়। এ বছর অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী হিসেবে বড়নগর গ্রামের মাহমুদা আক্তার, শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য বারদী বাজারের সুমী বণিক, সফল জননী আলগীরচরের মাসুদা বেগম, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে নতুন উদ্যমে জীবন শুরুর জন্য কৃষ্ণপুরা গ্রামের ইবতিদা রুপা ও সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখায় আলমদী গ্রামের নাছিমা আক্তারকে জয়িতা নির্বাচন করা হয়।

আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায় দুই বীরাঙ্গনা

প্রথমবারের মতো একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায় অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশের দুই বীরাঙ্গনা। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছেন বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা জাবেদা খাতুন (৭৭) ও আনোয়ারা বেগম (৬৮)। এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী কঙ্গোর চিকিৎসক ডেনিস মুকওয়েগে ওই আলোচনাসভার আয়োজন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই ডিসেম্বর ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন এবং বেগম রোকেয়া পদক ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

অনুষ্ঠানে তাঁরা যুদ্ধের সময় নিপীড়ন ও ধর্ষণের শিকার নারীদের পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে বৈশ্বিক ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা চালুর জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। সংঘাতের সময় যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকারকর্মীদের নিয়ে গঠিত একটি প্যানেল সভায়ও অংশ নেন তাঁরা।

হার্ভার্ড পুরস্কার পেলেন মালালা

নারী শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেডি স্কুল এ বছরের জন্য গ্লাইটসম্যান সিটিজেন অ্যাকটিভিস্ট পুরস্কারে ভূষিত করেছেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী মালালা ইউসুফজাইকে। ৬ই ডিসেম্বর এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১১ বছর বয়স থেকেই নারী শিক্ষা বিস্তারে কাজ শুরু করেন মালালা। এজন্য তালেবান তার ওপর হামলাও চালায়। ২০১৪ সালে ১৭ বছর বয়সে শান্তিতে নোবেল অর্জন করেন মালালা। তিনি বর্তমানে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রথমবারের মতো ভোট দিলেন বিলুপ্ত ছিটমহলবাসী

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিলেন পঞ্চগড় জেলার বিলুপ্ত ছিটমহলে বসবাসকারী নতুন বাংলাদেশিরা। এবারই প্রথম দীর্ঘ ৭১ বছর পর প্রথম ভোট দিয়েছেন তারা। শিখলেন কীভাবে ভোট দিতে হয়। দীর্ঘ ৬৮ বছর পর ২০১৫ সালে ১লা আগস্ট বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন হওয়ায় বিলুপ্ত ছিটমহলের বাসিন্দারা বাংলাদেশি নাগরিকত্বের গৌরব অর্জন করেন। আর দেশের মূল ভূখণ্ডে যুক্ত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো নিরাপদে-নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরে আনন্দিত বিলুপ্ত ছিটমহলের নারী-পুরুষ ভোটাররা। তাদের মধ্যে

বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত ভোটদান

আট হাজার ৯৩৫ জন নতুন ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। অনেকেই সকালবেলা পুরো পরিবার নিয়ে ভোট দিতে যান। ভোট দিতে পেরে নিজের জীবনে পরম পাওয়া জানিয়েছেন এ ভোটাররা। বিলুপ্ত ছিটমহলের বাসিন্দা ও বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি (বাংলাদেশ অংশের) সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বলেন, আমরা ছিটমহলবাসীরা জীবনের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে পেরে আনন্দিত। আশা করি, নির্বাচিতরা আমাদের পাশে দাঁড়াবেন।

প্রতিবন্ধী শিশুদের বিনামূল্যে বিনোদন

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রতিবারের মতো এবারও শিশুদের বিনোদনের জন্য রয়েছে শিশু পার্ক। আর এ পার্কে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যও রয়েছে বিনোদনের দারুণ সুযোগ। যে-কোনো প্রতিবন্ধী শিশু এ পার্কের প্রতিটি রাইডে উঠতে পারবে বিনামূল্যে। এখানে ট্রেন, টু-ইস্ট, নাগরদোলা, হেলিকপ্টার, ঘূর্ণিসহ রয়েছে অনেক মজার মজার রাইড। বিশেষ এই শিশুরা বিভিন্ন রাইডে চড়ে সবার সাথে হই-হুল্লোড় আর আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠেছে। শিশুদের সঙ্গে অভিভাবকরাও অংশ নিচ্ছেন।

সাধারণ শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতি রাইডে যেখানে ৩০-৪০ টাকা নেওয়া হচ্ছে, সেখানে প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিনামূল্যে এ আনন্দ উপভোগের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের এ শখ মেটাচ্ছে সারিকা ফ্যান্টাসি এমাজিং ওয়ার্ল্ড নামক শিশু পার্কটি। এটি বাণিজ্য মেলার পূর্ব পাশে অবস্থিত।

২৭শে জানুয়ারি পার্কটিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিনামূল্যে রাইড সেবা উদ্‌বোধন করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশী। এ সময় মন্ত্রী প্রতিবন্ধী শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সঙ্গে বিভিন্ন রাইডে চড়ে সময়ও কাটান।

বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধীরা এখন আর সমাজের বোঝা নয়, তারা সমাজের মূলধারায় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ তাদের নিয়ে কাজ করছেন। তাদের এগিয়ে নিতে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকার বদ্ধপরিকর পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক দায়িত্ব নিয়েই প্রতিক্রিয়ায় বলেন, পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। আগামীতে উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ গড়ার জন্য তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার প্রধান নিয়ামক হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা, আমরা এর জন্য কাজ করে যাচ্ছি। যে ভিশন নিয়েছি; শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেটা আমরা বাস্তবায়ন করব। কৃষি মন্ত্রণালয়ের বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কৃষিকে লাভজনক করা। নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা গণমাধ্যমের সহযোগিতা চাই। ১৩ই জানুয়ারি সচিবালয়ে নিজ দফতরে প্রথম কর্মদিবসে তিনি এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এর আগে মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, শেখ হাসিনার সময়ে খোরপোষের কৃষি বাণিজ্যিক কৃষি হয়েছে, খাদ্য ঘাটতির দেশ এখন খাদ্য রপ্তানি করছে। বাংলাদেশ দানাদার খাদ্য উৎপাদনে বিশ্বের রোল মডেল। বাজারজাত, প্রক্রিয়াজাত ও সঠিক মূল্য নির্ধারণ করার মাধ্যমে কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর করতে সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

কৃষির টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার সমন্বিত উদ্যোগ

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল শক্তি কৃষি। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন

এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তার সাথে জড়িত কৃষি ও কৃষক। কৃষির টেকসই উন্নয়নের জন্য তাই দরকার সমন্বিত উদ্যোগ। কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ২২শে জানুয়ারি ঢাকায় বিএআরসি'র অডিটোরিয়ামে কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এসডিজি রোডম্যাপ প্রণয়ন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মশালায় এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিনির্ভর অর্থনীতির এ দেশে কৃষির ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। দেশ ও জাতির বৃহৎ স্বার্থে কৃষককে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখার জন্য সরকার সবসময়ই আন্তরিক। যেহেতু কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধিতে দারিদ্র্য বেশি হারে কমে এজন্য উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজারজাত ও প্রক্রিয়ার পথও অবাধ করতে হবে। এর জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব বাস্তবায়ন করতে হবে।

মেধা, আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, সার্বিক অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। কৃষির বিকাশে যারা কাজ করছেন তারা দেশ ও জাতির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই দায়িত্ব মেধা, আন্তরিকতা ও সততার সঙ্গে পালন করতে হবে। আগামীতে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার জন্য তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার প্রদান নিয়ামক হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি। নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির জন্য আমাদের সবাইকে আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। ১৬ই জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মাসিক এডিপি সভায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী। তিনি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে এটাই তাঁর প্রথম সভা।

কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, কৃষি প্রকৃতি নির্ভর একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যে-কোনো সময় দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বাংলাদেশ দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন করে কৃষিতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন আজ বিশ্ব স্বীকৃত। তেলের ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনার জন্য দেশব্যাপী বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণের কথা উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমরা সবাই মিলে ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য এমন কাজ করে যেতে চাই–যা অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

৩৯ হাজার ৩১৭ জন শিক্ষক নিয়োগে সুপারিশ করেছে এনটিআরসিএ

সারাদেশে ১৫ হাজার ১৫৭টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ মেধাবী ৩৯ হাজার ৩১৭ জনকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। এনটিআরসিএ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, প্রার্থীদের আবেদনের পর চাহিদার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান ও নির্বাচিত প্রার্থীকে এসএমএসের মাধ্যমে ২৪শে জানুয়ারি ২০১৯-এ অবহিত করা হয়েছে।

এনটিআরসিএ-এর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এনটিআরসিএ পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে চাহিদা চাওয়া হয়। ২৬শে আগস্ট ২০১৮ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ১৫ হাজার ১৮৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ৩৯ হাজার ৫৩৫টি পদের চাহিদা পাওয়া যায়। পদগুলোর জন্য নিবন্ধন সনদধারীদের কাছ থেকে ১৯শে ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে এ বছরের ২রা জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হয়। এতে ৩৯ হাজার ৫৩৫টি পদের বিপরীতে ২৫ লাখ ৭৯ হাজার ১৯৬টি আবেদন পাওয়া যায়। পরবর্তীতে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনলাইনে ভুল চাহিদা প্রদান করেছে বলে লিখিতভাবে জানালে ১৩২টি প্রতিষ্ঠানের ২১৮টি পদের জন্য নিয়োগ আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। আর ১৫ হাজার ১৫৭টি প্রতিষ্ঠানের ৩৯ হাজার ৩১৭টি পদের বিপরীতে যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ও নিবন্ধন সনদধারী আবেদনকারীদের মধ্য থেকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নারী কোটা পূরণ সাপেক্ষে সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা অনুসরণ করে সর্বোচ্চ মেধাবীকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য সুপারিশ চূড়ান্ত করে পাঠিয়েছে এনটিআরসিএ।

এক লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হবে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক সিটিতে

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক সিটিতে কর্মসংস্থান হবে এক লাখ তরুণ-তরুণীর। এছাড়াও বিনিয়োগ হবে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্কে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৩শে জানুয়ারি দুপুরে পরিদর্শনকালে হাইটেক পার্কের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও সফলতার কথা জানিয়ে একথা বলেন তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। এসময় বিনিয়োগ করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প স্থাপনা, জাতীয় তথ্য কেন্দ্রসহ পার্কের বিভিন্ন স্থাপনা ও প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখেন প্রতিমন্ত্রী।

পরিদর্শন শেষে হাইটেক পার্ক প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, আমরা প্রথমে ২৩২ একর জায়গা পাই। এরপর প্রধানমন্ত্রী আরো ৯৭ একর জায়গা আমাদের দেন। আরো কিছু মিলিয়ে আমাদের এখন মোট আয়তন প্রায় ৩৫৫ একর। আগে থেকে আমাদের এখানে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করেছে। আর নতুন দেওয়া ৯৭ একর জায়গা আরো ১৮টি কোম্পানিকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রায় দুই লাখ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট টেকনো সিটি বিডি লিমিটেড, ২৭ হাজার ২৬০ বর্গফুট আয়তনের ওপর সার্ভিস বিল্ডিং, ১৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম ডাটা সেন্টারসহ বিভিন্ন স্থাপনার কাজ প্রায় শেষ। নতুন বরাদ্দ পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোও দ্রুত তাদের স্থাপনা নির্মাণে কাজ শুরু করবে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

দ্রুতগতির ঢাকা বাইপাস সড়ক নির্মাণ

যানজট নিরসনে পণ্য নিয়ে ট্রাক-লরির মতো ভারী যানবাহন আর ঢাকায় প্রবেশ করবে না। রাজধানীর পাশ দিয়ে চট্টগ্রামসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় ১২০ কিলোমিটার গতিতে চলে যাবে এসব পণ্যবাহী যানবাহন। এজন্য জয়দেবপুর দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর পর্যন্ত ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেন

বিশিষ্ট দ্রুতগতির ঢাকা-বাইপাস সড়ক নির্মাণ করা হবে। আর এশিয়ান হাইওয়ের অংশ হিসেবে গৃহীত এ প্রকল্পটিতে এবার যুক্ত হলো এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার এ প্রকল্পে আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবে এই উন্নয়ন সংস্থাটি। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে নির্মাণ হবে প্রকল্পটি। সমন্বিতভাবে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে চায়না ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সিচুয়ান রোড অ্যান্ড ব্রিজ গ্রুপ করপোরেশন, শামীম এন্টারপ্রাইজ ও ইউডিই কনস্ট্রাকশন লিমিটেড। ৩রা জানুয়ারি এ তিন প্রতিষ্ঠানের কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে এ বিষয়ে সরকারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পসূত্রে জানা যায়, এশিয়ান হাইওয়ের দুটি আন্তর্জাতিক (এএইচ-১, এএইচ-২) ও একটি আঞ্চলিক (এএইচ-৪১) রুট বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করেছে। রুট তিনটির অন্তর্ভুক্ত ১ হাজার ৭৪১ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করা হচ্ছে। এশিয়ান হাইওয়ে মানের সড়ক মূলত 'প্রাইমারি বা ধমনি সড়ক' নামে পরিচিত। এগুলোর প্রবেশ সংরক্ষিত থাকে, যাতে অযান্ত্রিক (স্কুটার, সিএনজি, অটোরিকশা, ভ্যান, বাইসাইকেল) যানগুলোর পৃথক সড়ক (সার্ভিস রোড) থাকবে। আর প্রাইমারি সড়কের দুই পাশে নিরাপত্তামূলক বেষ্টনী বা সীমানাপ্রাচীর থাকবে যাতে ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার বেগে গাড়ি চলতে পারে। ন্যূনতম চার লেনের এসব সড়কে কোনো মোড় থাকবে না। এছাড়া সড়কের দুই পাশে কমপক্ষে ৫০ মিটারের মধ্যে কোনো জনবসতি বা স্থাপনা রাখা যাবে না। প্রতি কিলোমিটার পর পর উল্লেখ থাকবে পরবর্তী জেলার নাম ও দূরত্ব। এসব সড়কের পাশ দিয়ে পথচারী চলাচল বা আড়াআড়ি সড়ক পারাপারও নিষিদ্ধ থাকবে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ নবম

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঝুঁকির মধ্যে থাকা শীর্ষ ১৫টি দেশের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে নবম স্থানে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভানুয়াতু দ্বীপটি বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সবচেয়ে কম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে কাতার। ঝুঁকিপূর্ণ ১৫টি দেশের মধ্যে ৯টি বিভিন্ন দ্বীপদেশ।

২০১৮ সালে ১৭২টি দেশের ভূমিকম্প, সুনামি, হারিকেন এবং বন্যার ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব দুর্যোগ মোকাবিলা করার মতো সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সক্ষমতা যাচাই করা হয়েছে। জার্মানির রুহর বিশ্ববিদ্যালয় বোখাম এবং ডেভেলপমেন্ট হেল্প অ্যালায়েন্স নামে একটি জার্মান বেসরকারি মানবিক সংস্থা যৌথভাবে এই গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষকরা মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শিশুদের দুর্দশার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তথ্যমতে, বিশ্বব্যাপী প্রতি চারটি শিশুর মধ্যে একটি দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বসবাস করে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রের স্তর বেড়ে যাওয়াসহ নানা কারণে তালিকার শীর্ষে রয়েছে দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো। ভানুয়াতু দ্বীপের পর দ্বিতীয় ঝুঁকিপূর্ণ দেশ টোঙ্গা, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে আরেক দ্বীপদেশ ফিলিপাইন, যার মোট লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে ১০ কোটি।

জলবায়ু তহবিলের পরিমাণ বাড়ালো বিশ্বব্যাংক

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তহবিলের আকার আরো বাড়িয়ে ২০ হাজার কোটি ডলার করেছে বিশ্বব্যাংক। ২০২১ থেকে

২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিবছর এই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে। বিশ্বব্যাংক জানায়, জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান মাত্রা অব্যাহত থাকলে বিলুপ্তির হুমকিতে থাকবে মানবজাতি। এ পরিস্থিতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বিশ্বব্যাংকের বর্ধিত তহবিল।

এই তহবিলের অর্থ বাড়ানোর কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষায় নতুন সৃজনশীল পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ হবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

কর্ণফুলি নদীর তলদেশে নির্মিত হচ্ছে দেশের প্রথম টানেল

চট্টগ্রামের সাথে সারাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ চট্টগ্রামের তথা কক্সবাজার-টেকনাফ পর্যন্ত যোগাযোগ ও চট্টগ্রামের শহরের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করার জন্য কর্ণফুলি টানেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ সমগ্র বিষয় মাথায় রেখে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে নির্মিত হচ্ছে দেশের প্রথম টানেল। মিয়ানমার হয়ে প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে সংযুক্তিসহ ৭টি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য এগিয়ে নেওয়ার জন্য টানেল নির্মার্ণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দেশের ফাস্ট ট্র্যাক মেগা প্রকল্পের অন্যতম কর্ণফুলি টানেল ২০২২ সালের মধ্যে নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

চট্টগ্রাম শহরের পতেঙ্গা নেভাল একাডেমি সংলগ্ন এলাকায় কর্ণফুলি নদীর মোহনার পাশ ঘেঁষে কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। ৪ লেন বিশিষ্ট দুটি টিউব সংবলিত ৩ দশমিক ৪ কিলোমিটার নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মিত হচ্ছে। এছাড়া টানেলের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তে ৫ দশমিক ৩৫ কিলোমিটার এপ্রোচ রোড এবং ৭২৭ মিটার ওভার ব্রিজ সম্পন্ন টানেলটি চট্টগ্রাম শহরের সঙ্গে আনোয়ারা উপজেলাকে সংযুক্ত করবে। চায়নার 'ওয়ান সিটি' এবং 'টু টাউন' মডেলের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সামনে রেখে টানেলটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯ হাজার ৮৮০ কোটি টাকা। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ৩৮৩ একর। চীনের চায়না কমিউনিকেশন এবং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (সিসিসিসি) টানেল নির্মাণের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। টানেল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হারুন রশিদ চোধুরী জানান, যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও দেশের নবীন প্রকৌশলীরা টানেল নির্মাণের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। সে অভিজ্ঞতা আগামীতে

কর্ণফুলি নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন টানেলের মডেল

ঢাকায় সেতু বিভাগ কর্তৃক যে আন্ডারগ্রাউন্ড সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হবে তাতে কাজে লাগাতে পারবে। আগামী ২০২২ সালে প্রকল্পটির কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

২৫ জেলায় নিরাময়কেন্দ্র ও জেলে পৃথক সেল হচ্ছে

সারাদেশে ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়া মাদকের বিস্তার রোধ এবং মাদকাসক্তি নিরাময়ে বেশ কিছু উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সরকার। এর

অংশ হিসেবে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র না থাকা ২৫ জেলায় কেন্দ্র স্থাপন ও কারাগারগুলোতে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য পৃথক সেল গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে ১৯শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এক সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে ও বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জামাল উদ্দীন আহমেদ বলেন, 'হাসপাতালে মাদকাসক্ত রোগীদের জন্য আলাদা ইউনিট করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি কারাগারে একটি করে সেল করা হবে। সেলগুলোতে মাদকাসক্ত বন্দিদের রাখা হবে।'

মাদকের বিস্তার রোধে সভায় আরো বেশ কিছু পদক্ষেপের ওপর জোর দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে মাদকবিরোধী তথ্যচিত্র প্রদর্শন, সীমান্ত দিয়ে মাদকপাচার রোধ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন দপ্তরগুলোর কার্যক্রম সার্বক্ষণিক তদারকি, মাদকমুক্ত অঞ্চল ঘোষণা করে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮ নিয়ে ব্যাপক প্রচার, বিভাগীয় পর্যায়ে নিয়মিত মাদকসংশ্লিষ্ট সভা আয়োজন অন্যতম।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতি বিভাগে কিডনি ও ক্যানসার হাসপাতাল স্থাপনের ঘোষণা

অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রতিটি বিভাগে একটি করে কিডনি ও ক্যানসার হাসপাতাল স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন নবনিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, এমপি। ৮ই জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আয়োজিত নতুন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী একথা জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে অসংক্রামক রোগ বিশেষ করে কিডনি ও ক্যানসার রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এসব রোগের চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল। দেশের সর্বত্র এই রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদানের পর্যাপ্ত অবকাঠামো নেই। তাই অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রতিটি বিভাগে একটি করে কিডনি ও ক্যানসার হাসপাতাল এবং জেলা পর্যায়ে একটি করে ক্যানসার ও কিডনি ইউনিট স্থাপন করা হবে।

জনগণের দোরগোড়ায় স্বল্প খরচে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। তিনি আরো জানান, গত দশ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাস্থ্য সেক্টরে প্রশংসনীয় সফলতা এসেছে। সফলতার এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখার পাশাপাশি দেশে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

নবনিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেককে ৮ই জানুয়ারি ২০১৯ মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান –পিআইডি

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে মেডিক্যাল ট্যুরিজম চালু

স্বল্প খরচে উন্নত চিকিৎসার জন্য চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে চালু হয়েছে মেডিক্যাল ট্যুরিজম। ৯ই জানুয়ারি ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশিত হয়। এতে আশা প্রকাশ করা হয়, এর মাধ্যমে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার হবে। চীনা দূতাবাসের উদ্যোগে প্রথম দফায় বাংলাদেশের ১৮ রোগীকে বিনা খরচে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

পরিকল্পিত গর্ভধারণে ডায়াবেটিস ঝুঁকি কমে

পরিকল্পিত গর্ভধারণে ডায়াবেটিসসহ অনেক রোগের ঝুঁকি কমে যাবে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার আরো কমে আসবে। গর্ভধারণ ও প্রসবকালীন জটিলতার অন্যতম মূল কারণ অপরিকল্পিত গর্ভধারণ। সম্প্রতি রাজধানীর বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির (বাডাস) সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তারা এই তথ্য জানান। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে বাডাস প্রসব-পূর্ব বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা নামে একটি প্যাকেজও চালু করেছে বাডাস।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, এ কর্মসূচি সফল করতে ৩০০ স্বাস্থ্যকর্মীর পাশাপাশি ৪০০ জন কাজিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষিত কাজিরা বিয়ের অনুষ্ঠানে নবদম্পতিদের এ সংক্রান্ত পরামর্শ দেন এবং তাদের গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন।

এছাড়া, বাডাস অধিভুক্ত সমিতির কেন্দ্র ও হাসপাতালে ৫০টি গর্ভধারণ সেবা কর্নার চালু করা হয়েছে।

বিনামূল্যে ব্রেস্ট ক্যানসার স্ক্রিনিং সেবা

জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল ১লা ডিসেম্বর থেকে ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নারীদের জন্য বিনামূল্যে স্তন ক্যানসার স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করেছে। প্রতি কর্মদিবসে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত হাসপাতাল ভবনের নিচতলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি আল্ট্রাসনোগ্রাম, এফএনএসিসহ বিভিন্ন পরীক্ষা বিনামূল্যে করা হয়। এসকেএফসহ অন্যান্য অ্যান্টি ক্যানসার ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এ কার্যক্রমে অংশ নেয়।

বিপুলসংখ্যক মানুষ কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা নিচ্ছেন

বর্তমানে প্রতি মাসে ৮০ থেকে ৯০ লাখ মানুষ কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা নিচ্ছেন। এসব ক্লিনিকে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীরা সেবা দিচ্ছেন। রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। ক্লিনিকে দেওয়া হয়েছে ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট সুবিধা। চালু করা হয়েছে ই-হেলথ ও টেলিমেডিসিন সেবা। ৫ই ডিসেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে *সাফল্যের জোয়ারে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিশ্বের বিস্ময়* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দশ বছরের সাফল্য নিয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়।

আরো জানানো হয়, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার অবকাঠামো বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনবল বৃদ্ধি, অবকাঠামোর উন্নয়ন, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস, ওষুধের সরবরাহ বৃদ্ধি, কমিউনিটি ক্লিনিক চালু, স্বাস্থ্য খাতে ডিজিটাল কার্যক্রমসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে সরকার। দেশে ৯৯ শতাংশ উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে রয়েছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিসেবা। দেশের প্রায় ৯১.৩ শতাংশ শিশুকে টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। ফলে পোলিও ও ধনুষ্টংকার মুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থান হবে

আগামী পাঁচ বছরে প্রতি জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থান হবে বলে জানিয়েছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ। সমাজের মূল স্রোতধারার মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ত করা হবে বলেও জানান তিনি। লালমনিরহাট জেলা সার্কিট হাউজে জেলা সংবাদকর্মী ও সুশীল সমাজের সাথে 'নির্বাচন পরবর্তী উন্নয়ন ভাবনা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, দেশের সকল ক্ষেত্রেই এখন উন্নয়নের সফলতা দৃশ্যমান। এই উন্নয়নের জোয়ারে দেশের এক শ্রেণির মানুষ অবহেলিত থাকবে, পেছনে পড়ে থাকবে–তা হতে পারে না। আগামীতে একজন অটিজম আক্রান্ত শিশুর মা-বাবা তার সন্তানের জন্য মুখ লুকাবে না। নিজেকে আর অসহায় ভাবতে পারবে না।

চাকরিতে থাকছে প্রতিবন্ধী কোটা

সরকারি চাকরিতে কোটা তুলে দেওয়া হলেও প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত কোটা বহাল রয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম। ২২শে জানুয়ারি নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পর সচিবালয়ে প্রেস বিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান। প্রেস বিফিংয়ে প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনার খসড়া অনুমোদনের বিষয়ে কথা বলার এক পর্যায়ে সাংবাদিকরা প্রতিবন্ধীদের জন্য করা আইনে কোটার বিষয়টি উল্লেখ থাকায় সে বিষয়টি জানতে চান। জবাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, কোটার বিষয়ে মন্ত্রিসভায় আলোচনা না হলেও আইনে যে প্রভিশন আছে ওটা বাদ দেওয়া হয়নি। প্রশাসনিক আদেশ দিয়ে আইন কখনো সুপারসিড হয় না। প্রতিবন্ধীদের কোটা আইন অনুযায়ী যা ছিল, তাই আছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' এবং 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৫'-এর আলোকে প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনার খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রবেশগম্যতা যেমন- ভৌত অবকাঠামো, পরিবহণ ও যোগাযোগসহ জনসাধারণের প্রাপ্য সব সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যদের মতো সমসুযোগ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবহার উপযোগী নিশ্চিত করা।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বছরের প্রথম দিনে ৮৪২৮ শিশুর জন্ম

শিশুরা আমাদের আশা, আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদেরকে ঘিরেই বিস্তার করে আমাদের স্বপ্নজাল, জাগে বেঁচে থাকার প্রেরণা। এবার বছরের প্রথম দিনে ১লা জানুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছে ৮ হাজার

৪২৮ শিশু। আর সারাবিশ্বে জন্মেছে আনুমানিক ৩ লাখ ৯৫ হাজার ৭২ শিশু। যার ২ দশমিক ১৩ শতাংশ জন্মেছে বাংলাদেশে। জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের নিউইয়র্ক কার্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে ১লা জানুয়ারি এ তথ্য জানানো হয়। এদিন অর্ধেকের বেশি শিশু জন্মেছে ভারত, চীন, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কঙ্গো ও বাংলাদেশে। সবচেয়ে বেশি শিশু জন্মেছে ভারতে ৬৯ হাজার ৯৪৪ জন।

ঢাকায় এদিন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অনেক শিশু জন্মের খবর পাওয়া গেছে। শিশু জন্মের পাশাপাশি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে অনেক। সংস্থাটির হিসাবে, ২০১৭ সালে প্রায় ১০ লাখ শিশু জন্মের প্রথম দিনে এবং প্রায় ২৫ লাখ জন্মের প্রথম মাসেই মৃত্যুবরণ করেছে। এদের বেশির ভাগের মৃত্যু হয় অপরিণত অবস্থায় জন্মগ্রহণ, প্রসবকালীন জটিলতা এবং দূষণ ও নিউমোনিয়ার সংক্রমণের ফলে। তাই ইউনিসেফ প্রত্যেক প্রসূতি ও নবজাতকের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়তে হবে

তাজউদ্দীন আহমদ অ্যান্ড সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন আয়োজিত স্কুলভিত্তিক বই পড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয় ২৮শে জানুয়ারি কাপাসিয়া উপজেলার রূপনগর পালকি কমিউনিটি সেন্টারে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এ আসনের সাংসদ সিমিন হোসেন রিমি বলেন, পৃথিবীকে অশুভ মানুষের দখল থেকে মুক্ত করার হাতিয়ার হচ্ছে বই। বই মানে আলো। বই পড়লে জ্ঞান অর্জন করা যায়। জ্ঞান অর্জন করতে পারলে সমাজ রাষ্ট্রসহ সবজায়গায় আলোকিত মানুষ হওয়া সম্ভব। বই মানুষের জীবনকে সুন্দর করে। বই মানুষকে আলোকিত করে, এর মাধ্যমে নিজের মেধাকে বিকশিত করা সম্ভব।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমদ সোহেল তাজ। জানা যায়, উপজেলার ১১টি ইউনিয়নের ৪৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২ বছর ধরে এই বই পড়া কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। গেল বছর এই কর্মসূচিতে অংশ নেয় ১৪৫০০ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে মূল্যায়ন পরীক্ষা শেষে ২৩১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে এ বছর পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

কলকাতায় বাংলা গানের বর্ণাঢ্য উৎসব

বাংলা গানের কাছে সীমান্ত, কাঁটাতার এসব অর্থহীন। ৪ঠা জানুয়ারি কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরের নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পীদের অংশগ্রহণে 'বাংলা উৎসব'। তিন দিনের এ উৎসবে গান করেন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ২৯ জন শিল্পী। এ উৎসবের আয়োজন করে বাংলাদেশের গ্রুপ ও সর্বভারতীয় বন্ধন ব্যাংক।

শিল্পীদের শোভাযাত্রার মাধ্যমে শুরু হয় উৎসব। অনুষ্ঠানটি উদ্‌বোধন করেন বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। উৎসবে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয় বাংলাদেশের শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন ও ভারতের আরতি মুখোপাধ্যায়কে।

চারুকলার ৭০ বছর ও জয়নুল উৎসব ২০১৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের চারদিকে, বিশেষ করে চারুকলার বকুলতলাজুড়ে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ। এ উৎসবের উপলক্ষ চারুকলার ৭০ বছর পূর্তি এবং দেশের আধুনিক শিল্পাকলার পথিকৃত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন-এর জন্মদিন উদ্‌যাপন। এটির আয়োজক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২৫শে ডিসেম্বর ভোরে চারুকলা অনুষদের প্রথম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা আনোয়ারুল হকের সমাধিতে ফুল দিয়ে উৎসবের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর অনুষদের পাশে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, পটুয়া কামরুল হাসান এবং শিল্পগুরু সফিউদ্দিন আহমদের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে চারুকলা প্রাঙ্গণে বেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্‌বোধন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে অনুষদ প্রাঙ্গণ থেকে র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি টিএসটি প্রদক্ষিণ করে চারুকলা অনুষদে এসে শেষ হয়। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন, শিল্পাচার্যের পুত্র প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন, অধ্যাপক রফিকুন নবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ অবধি ছিল চারুকলা অনুষদের নানা আয়োজন। ২৯শে ডিসেম্বর জয়নুল আবেদীনের জন্মদিনে উৎসবের সমাপন করা হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটির জাদুঘর উন্মুক্ত

ঐতিহাসিক নিমতলী প্রাসাদের নাম এখনো লোকমুখে রয়ে গেছে। বাস্তবে প্রাসাদটি নেই। টিকে আছে শুধু প্রবেশদ্বার। এখানে গড়ে উঠেছে নতুন এই জাদুঘর। ৩রা জানুয়ারি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সর্বসাধারণের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি ঐতিহ্য জাদুঘর উন্মুক্ত করা হয়। সোসাইটির সভাপতি মাহফুজা খানম এক হাজার টাকা দিয়ে ৫০টি টিকিট কিনে জাদুঘর পরিদর্শনের কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। জাদুঘর প্রতি শুক্র ও শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে জানুয়ারি ২০১৯ তাঁর কার্যালয়ে সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিলেন প্রধানমন্ত্রী

৩১শে জানুয়ারি ২০১৯ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৫০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। আগামী বছর থেকে এই বৃত্তিপ্রাপ্তের সংখ্যা ২ হাজারে উন্নীত করা হবে বলে জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে সব জনগোষ্ঠীর সমান সুযোগ নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার। কেবল পার্বত্য অঞ্চল নয়, সমতল ভূমিতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য আলাদাভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বৃত্তির ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। তার সঙ্গে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। স্ব স্ব পেশায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত বিষয় ব্যবহার করে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে বলে আমি মনে করি।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মো. সাজ্জাদুল হাসান এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) খলিলুর রহমান। বরগুনার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বুয়েটের শিক্ষার্থী মিয়াট বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পক্ষে নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করেন। এছাড়া, সমতলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, বৃত্তিপ্রাপ্তদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রকল্পের নানা দিক সংবলিত কয়েকটি ছোটো ছোটো ভিডিও চিত্র অনুষ্ঠানে দেখানো হয়েছে।

পাঁচবিবিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান

পাঁচবিবি উপজেলার ১৭৯ জন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অসহায় গরিব ছাত্রছাত্রীদের মাঝে চার লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। ৮ই জানুয়ারি উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে এ শিক্ষা বৃত্তির টাকা শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ১১০ জন শিক্ষার্থীকে ১ হাজার পাঁচশ, একাদশ শ্রেণির ৩৬ জন শিক্ষার্থীকে ২ হাজার চারশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ১৩ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে ৪ হাজার পাঁচশ টাকা করে প্রদান করা হয়। পামডো'র নির্বাহী পরিচালক হৈমন্তী সরকারের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিবুল আলম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী হলেন বীর বাহাদুর উশৈসিং

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নতুন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব হাতে নিলেন বীর বাহাদুর উশৈসিং। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী আওয়ামী লীগ সরকারের ৪৭ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যরা ৮ই জানুয়ারি শপথ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ২৪ জন পূর্ণমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে তিনি একজন।

মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিংকে বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা শুভেচ্ছা জানান

ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থীরা পেল নতুন বই

নতুন বছরের নতুন দিন, ১লা জানুয়ারি ২০১৯। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থীরা হাতে পেয়েছে নতুন বই। এবার বই উৎসবে তাদের নিজস্ব ৫টি ভাষায় শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

'নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ' স্লোগান নিয়ে ৯ই জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে 'ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'। এটি উৎসবের সপ্তম আসর। রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের আয়োজনে এবারের উৎসবে বিশ্বের ৭২টি দেশের ২১৮টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে ১২২টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও ৯৬টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে

উৎসবের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্যসচিব আবদুল মালেক। উদ্‌বোধন শেষে প্রদর্শিত হয় তুরস্কের নির্মাতা আন্দাজ হাজানেদারগলু পরিচালিত চলচ্চিত্র 'দ্য গেস্ট'। যমুনা ব্লকবাস্টার সিনেমা হল, জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তন ও কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন, কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন, শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন ও অলিয়ঁস ফ্রঁসেজ– এই ৬টি মিলনায়তনে প্রদর্শিত হয় উৎসবের ছবিগুলো।

৬৪ জেলায় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজনে 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি সিনেমা নিয়ে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দেশীয় চলচ্চিত্রের বিকাশ ও উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ও নির্মল চলচ্চিত্র আন্দোলনের অংশ হিসেবেই এ আয়োজন করা হয়। এই আয়োজন চলে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারের উৎসবে ৪৮টি স্বল্পদৈর্ঘ্য এবং ২২টি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এ উৎসবের প্রথম দিনে প্রদর্শন করা হয় মাহমুদ হাসান পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'ইতিবৃত্ত কিংবা বাস্তবতার পুনরারম্ভ'। এতে অভিনয় করেন–ফারিয়া আফরিন রুপু, শরিফুল ইসলাম সেলিম প্রমুখ।

এশিয়া চলচ্চিত্র উৎসবে 'কালের পুতুল'

বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিতব্য ষষ্ঠ এশিয়া চলচ্চিত্র উৎসবে ইমপ্রেস টেলিফিল্মের 'কালের পুতুল' প্রদর্শিত হয়। এ উৎসবের 'ডিসকভারিস' বিভাগে দেখানো হয় ছবিটি। রহস্যঘেরা গল্প নিয়ে নির্মিত এ ছবিটি গত বছরের মার্চে মুক্তি পায়। আকা রেজা গালিব পরিচালিত চলচ্চিত্রটি বিভিন্ন উৎসবে অংশ নিয়েও প্রশংসিত হয়েছে। এর কাহিনি ও চিত্রনাট্য করেছেন নাসিফুল ওয়ালিদ। এতে অভিনয় করেন–ফেরদৌস, বীথি রানী সাহা, জান্নাতুন নূর মুন, শাহেদ আলী, রাইসুল ইসলাম আসাদ, লুৎফর রহমান জর্জ, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, আশিষ খন্দকার, ঋতু সাত্তার, আরিফ অর্ক প্রমুখ। সংগীত পরিচালনা করেন সানি জুবায়ের। এ উৎসবে ২০টি দেশের পাঁচ শতাধিক চলচ্চিত্র জমা পড়েছিল। ১০০ সিনেমা মনোনীত হয়। ৩১শে অক্টোবর থেকে ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত চলে এ উৎসব। এ উৎসবে বাংলাদেশ থেকে আরো দুটি ছবি প্রদর্শিত হয়। ছবি দুটি হলো ফখরুল আরেফিন খানের 'ভুবন মাঝি' এবং মোস্তফা সরওয়ার ফারুকীর 'ডুব'। এ ছবি দুটি দেখানো হয় যথাক্রমে স্পেশাল ও নেটপ্যাক ক্যাটাগরিতে।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

টাইগারদের সিরিজ জয়

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গত ১৪ই ডিসেম্বর ২-১ ব্যবধানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সিরিজ নিজেদের করে নেয় টাইগাররা। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন টাইগার অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা। মিরাজ, মাশরাফি ও সাকিবদের বোলিং দাপটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯৮ রান করে। ১৯৯ রানের টার্গেটে নেমে ৬৯ বল হাতে রেখেই সিরিজ জয় করে টাইগাররা।

আইসিসির বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি একাদশে বাংলাদেশের রুমানা

প্রথমবারের মতো নারী ক্রিকেট

দলের হাত ধরেই বাংলাদেশে আসে আইসিসি স্বীকৃত কোনো ট্রফি। আর এ দলের সদস্য রুমানা আহমেদ এবার জায়গা করে নিলেন আইসিসির বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি দলে। পুরুষ ক্রিকেটের মতো বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটেও লেগেছে উন্নতির হাওয়া।

রুমানা আহমেদ

ক্রিকেটের বিশ্বমঞ্চে নিজেদের প্রমাণও করেছেন সালমা-রুমানারা। জয় করেছে নারী এশিয়া কাপের শিরোপা। এরই ধারাবাহিকতায় আইসিসির বর্ষসেরা একাদশে জায়গা পেলেন বাংলাদেশের এই ক্রিকেটার।

গত ৩১শে ডিসেম্বর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২০১৮ সালের সেরা ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি নারী দল ঘোষণা করেছে আইসিসি। ওয়ানডে দলে বাংলাদেশের কেউ সুযোগ না পেলেও টি-টোয়েন্টি দলে প্রতিনিধিত্ব করছেন রুমানা আহমেদ।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার বর্ষসেরা ওয়ানডে একাদশে মুস্তাফিজ

বছর শেষে ক্রিকেটের ২০১৮ সালের পঞ্জিকাবর্ষে কে কেমন খেলল এ নিয়ে চলছে আলোচনা, সাজোনো হচ্ছে সেরা দল। সেই ধারাবাহিকতায় ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের খতিয়ান বের করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আর তাদের বর্ষসেরা ওয়ানডে একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশের কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুর রহমান। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বিশ্লেষণ–বাংলাদেশ স্পিনারদের দাপুটে একটি বছরে বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজ ছিলেন দারুণ ধারাবাহিক। বছরে তার আলোচিত পারফরম্যান্স এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৪৩ রানে ৪ উইকেট শিকার। ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ১০ ওভারে ৩৮ রানে ২ উইকেট নেন তিনি। এছাড়া আফগানিস্তানের বিপক্ষে নতুন দলে দারুণ বোলিং এবং শেষটায় যে জাদুকরি বোলিং করেন তা প্রশংসার দাবি রাখে।

বিপিএল ২০১৯

গত ৫ই জানুয়ারি শুরু হয়েছে বিপিএলের ৬ষ্ঠ আসর। চতুর্থ ও পঞ্চম আসরের মতো এবারে কোনো উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান ছাড়াই শুরু হয়েছে জাঁকজমকপূর্ণ এ আসরটি। বিপিএলের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ৮ই ফেব্রুয়ারি। গতবারের মতো এবারও ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামের তিনটি ভেন্যুতে খেলা হচ্ছে।

৩১শে জানুয়ারি বিপিএলের পয়েন্ট টেবিল

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট	রানরেট
রংপুর	১১	৭	৪	১৪	+০.৬৯০
কুমিল্লা	১০	৭	৩	১৪	+০.৪৯৫
চিটাগাং	১১	৭	৪	১৪	-০.১৮৭
রাজশাহী	১২	৬	৬	১২	-০.৫১৮
ঢাকা	১০	৫	৫	১০	+০.৯৫৮
সিলেট	১১	৪	৭	৮	+০.০৬৭
খুলনা	১১	২	৯	৪	-১.১৬৫

এ টুর্নামেন্টে মোট ৪৬টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। শেষ চারের প্রতিটি ম্যাচের পরই একদিন করে রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে। বিপিএলে অংশ নেওয়া দলগুলো হলো– ঢাকা ডায়নামাইটস, খুলনা টাইটানস, রংপুর রাইডার্স, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়াস, রাজশাহী কিংস, সিলেট সিক্সার্স ও চিটাগাং ভাইকিংস।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

বিশ্বজুড়ে ফেব্রুয়ারি: স্মরণীয় ও বরণীয়

১লা ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ : ব্রিটেন কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি প্রদান
২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ : বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমান-এর জন্ম
২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ : সাহিত্যে নোবেলজয়ী ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মৃত্যু
২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ : চিত্রশিল্পী কামরুল হাসানের মৃত্যু
৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ : প্রথম মহাকাশযান হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান Luna-1-এর চাঁদে অবতরণ
৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৬২৮ : সম্রাট শাহজাহানের আগ্রার সিংহাসনে আনুষ্ঠানিক আরোহণ
৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ : সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধানরা ইয়াল্টা সম্মেলনে মিলিত হন
৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ : যুক্তরাজ্য ও তৎকালীন পশ্চিম জার্মানি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে
৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ : বাংলাদেশ বিমানের প্রথম ফ্লাইট ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করে
৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ : বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যু
৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০০৪ : মার্ক জুকারবার্গ ও তার চার বন্ধু কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক প্রতিষ্ঠিত
৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক লাহোরে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন
৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮১২ : ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স-এর জন্ম
৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ : ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) গঠনে ঐতিহাসিক 'ম্যাসট্রিচট চুক্তি' স্বাক্ষরিত
৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ : কথাসাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু
৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ : সৌরজগতে সর্বশেষ 'হ্যালির ধূমকেতু' দেখা যায়
১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ : কবি নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম
১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ : নোবেলজয়ী জার্মান পদার্থবিদ উইলহেম রন্টজেনের মৃত্যু
১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ : স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি শুরু
১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ : 'ছন্দের জাদুকর' নামে খ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম
১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ : রম্য সাহিত্যিক ও বহু ভাষাবিদ সৈয়দ মুজতবা আলীর মৃত্যু
১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ : ২৭ বছর কারাভোগের পর দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তিলাভ
১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ : কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জন্ম
১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০১২ : জনপ্রিয় অভিনেতা হুমায়ূন ফরিদীর মৃত্যু
১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৪৮৩ : মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবরের জন্ম
১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ : ফ্রান্স স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়
১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ : সাংবাদিক, সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সারের জন্ম
১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর মৃত্যু
১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ : কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম
১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা পাকিস্থানি সেনাবাহিনীর হাতে নিহত
২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ : বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণ
২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০০ : বিশ্বে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত
২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ : গণ-আন্দোলনের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে পাকিস্তান সরকার
২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ : স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় পাকিস্তান
২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ : ভাষা শহিদদের স্মরণে ঢাকা মেডিক্যাল প্রাঙ্গণে নির্মিত হয় প্রথম শহিদ মিনার
২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ : সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান
২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ : গণ-অভ্যুত্থানের মুখে পাকিস্তানের স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পদত্যাগ
২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ : ঢাকার পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহে অর্ধশত সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত
২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ : জাতীয় সংসদ ভবনের উদ্‌বোধন
২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৭৯৬ : যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে ঐতিহাসিক ওয়াশিংটন চুক্তি স্বাক্ষরিত।

শহীদুল্লাহ কায়সার

সাংবাদিক ও খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার ১৯২৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর পিতা মাওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ প্রথমে কলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যাপক ও পরে ঢাকা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষ ছিলেন।

শহীদুল্লাহ কায়সার কলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়া থেকে প্রবেশিকা (১৯৪২) এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আইএ (১৯৪৪) ও অর্থনীতিতে অনার্সসহ বিএ (১৯৪৬) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৭-এ পকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এমএ ক্লাসে ভর্তি হন। তিনি ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তিন বছর কারাভোগের পর তাঁকে ১৯৫৫ সালে পুনরায় গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়।

শহীদুল্লাহ কায়সার ১৯৪৯ সালে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় যোগদানের মাধ্যমে সাংবাদিক জীবন শুরু করেন। পরে *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। এই পত্রিকায় দেশপ্রেমিক ছদ্মনামে 'রাজনৈতিক পরিক্রমা' ও বিশ্বকর্মা ছদ্মনামে 'বিচিত্র কথা' শীর্ষক উপসম্পাদকীয় রচনা করেন।

তিনি ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ডা. আর আহমদের কন্যা কমিউনিষ্ট কর্মী জোহরা বেগমের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। জোহরা বেগমের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে ১৯৬৯ সালে পান্না কায়সারের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

বাঙালি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রামী চেতনার রূপায়ণ শহীদুল্লাহ কায়সারের উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য দিক। *সারেং বৌ* (১৯৬২) ও *সংশপ্তক* (১৯৬৫) তাঁর দুখানি বিখ্যাত উপন্যাস। *রাজবন্দীর রোজনামচা* (১৯৬২) তাঁর স্মৃতিকথা। *পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ* (১৯৬৬) ভ্রমণবৃত্তান্ত। তিনি *সারেং বৌ* উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার (১৯৬২) এবং উপন্যাসে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২) লাভ করেন।

শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বিশিষ্ট সাধক, প্রগতিশীল রাজনীতিক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রপথিক। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের মাত্র দুদিন আগে ঢাকার কায়েতটুলীর বাসভবন থেকে পাক হানাদারবাহিনীর এদেশীয় দোসর আলবদর বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে অপহরণ করে। পরে তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

প্রতিবেদন: নাসরিন নিশি